।। ফোটোমিতি ।।

আলো একটা শক্তি । সুতরাং পরিমাপ যোগ্য । আলোকশক্তির পরিমাপ পদ্ধতিকে ফোটোমিতি বলে । ফোটোমিতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় এবং কয়েকটা রাশি ঃ

১। উৎসের দীপনশক্তি ঃ (Illuminating power of luminous intensity of a source)

একটা মোমবাতির আলো থেকে একটা বাল্বের আলো অনেক বেশী উজ্জ্বল । কোন উৎসের দীপনশক্তি হল আলোকসৃষ্টির ব্যাপারে উৎসের ক্ষমতা বা তীব্রতা—কোন উৎস থেকে একক দূরত্বে একক বর্গস্থানে প্রতি সেকেন্ডে যতখানি আলো লম্বভাবে পড়বে তাকে ঐ উৎসের দীপনশক্তি বলে ।

বিভিন্ন উৎসের দীপনশক্তির পরিমাপ বোঝার জন্য একটা নির্দিষ্ট প্রমাণ মোমবাতির দীপনশক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই প্রমাণ মোমবাতিটা স্পারম আসেটিক মোমের ৭/৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১/৬ পাউন্ড ওজনের তৈরি । এটা জ্বলনের হার ঘন্টায় ১২০ গ্রেন । এই প্রমাণ মোমবাতির দীপনশক্তি—এক 'ক্যান্ডেল পাওয়ার'।

সরকারীভাবে হারকোর্ট পেনটেনকে প্রমাণ বাতি হিসাবে ধরা হয় । এই বাতিতে বায়ু এবং পেনটেন বাষ্পের মিশ্রণকে জ্বালানো হয় । এবং হারকোর্ট পেনটেনবাতি প্রমাণ মোমবাতি (ক্যান্ডল পাওয়ার) থেকে দশগুণ বেশী উজ্জ্বল বা আলো বিকীর্ণ করে । সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্যান্ডল পাওয়ার হল 'হারকোর্ট' পেনটেন বাতির দীপনশক্তির এক-দশমাংশ ।

এই ক্ষেত্রে আর যা উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন দেশের 'প্রমাণবাতি' ভিন্ন ভিন্ন । জার্মানীর প্রমাণবাতি 'হেফনার' । হেফনার বাতির দীপনশক্তি ০.৯ আন্তর্জাতিক ক্যান্ডল পাওয়ারের সমান । আবার ফ্রান্সের প্রমাণবাতি 'কারসেল' । কারসেল বাতির দীপনশক্তি ৯.৬ আন্তর্জাতিক ক্যান্ডল পাওয়ারের সমান ।

বিভিন্ন দেশের আলোর দীপনশক্তি পরিমাপক প্রমাণবাতি ভিন্ন ভিন্ন বলে এবং এদের দীপনশক্তি আগের প্রমাণবাতির তুলনায় বিভিন্ন হওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক কাজের সুবিধার্থে ১৯৪৮ সালে একটা সর্বসম্মত 'প্রমাণবাতি' স্থির করা হয়েছে। প্লাটিনামের গলনাংকের তাপমাত্রার মধ্যে অবস্থিত কোন কালো বিকিরক বস্তুর ১ বর্গ সেন্টিমিটার ছিদ্র দিয়ে যে পরিমাণ আলোক বের হয়, তার ষাট ভাগের এক ভাগ-কে আন্তর্জাতিক দীপনশক্তির 'একক' হিসাবে ধরা হয় । এই একক-এর নাম 'ক্যান্ডেলা'।

২। আলোক-প্রবাহ ঃ (Flux of light)

কোনও আলোকবিন্দু থেকে আলো তার চারদিকে সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে । এখন যদি ধরে নিই যে, আলোকবিন্দুর চারদিকে একটা বদ্ধতল (Closed Surface) আছে, তবে, আলো যে হারে ঐ বদ্ধতল অতিক্রম করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, সেই 'হার'কে 'আলোক-প্রবাহ' বলা হবে ।

'আলোক-প্রবাহ'-এর একক 'লুমেন'—এক 'ক্যান্ডেলা' দীপনশক্তির কোন বিন্দুপ্রভব একক ঘনকোণের মধ্যে দিয়ে যতটা আলো পাঠায় তাকে এক 'লুমেন' বলে । যেহেতু বদ্ধতল বিন্দুপ্রভবে মোট চার ঘনকোণ উৎপন্ন করে, তাই ১ ক্যান্ডেলা = ৪ লুমেন ।

৩। দীপনমাত্রা ঃ (Intensity of illumination)

সূর্যের আলো কোন জায়গায় বা তলের উপর সরাসরি পড়তে পারে, আবার কোন জায়গায় বা তলের উপর কোন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে—ধরা যাক, কাপড়ের মধ্যে দিয়েও পড়তে পারে । এই ক্ষেত্রে উভয় জায়গায় বা তলে আলোর উজ্জ্বলতা কিন্তু এক হবে না । সূর্যের আলো যে তলের উপর সরাসরি পড়ে তার উজ্জ্বলতা বেশী হয় । দীপনমাত্রা বলতে সাধারণ ভাবে বলা যায়, আলোর উৎস থেকে কোন তলের উপর কত আলো পড়ছে তার পরিমাপ ।

কোন আলোক বিন্দুর দীপনমাত্রা বলতে বোঝায় ঐ আলোক বিন্দুর চারদিকের একক বর্গ পরিমিত জায়গায় প্রতি সেকেন্ডে লম্বভাবে যে আলো পড়ছে, তার পরিমাণ । এফ. পি. এস. পদ্ধতি অনুযায়ী দীপনমাত্রার একক 'ফুট-ক্যান্ডেল' (FOOT CANDLE) । কোন তলের উপর লম্বভাবে প্রতি বর্গফুটে প্রতি সেকেন্ডে এক লুমেন আলো পড়লে, ঐ ক্ষেত্রের দীপনমাত্রাকে এক ফুট-ক্যান্ডেল বলা হয় । 'ফুট-ক্যান্ডেল'কে লুমেন / বর্গফুটেও প্রকাশ বা উল্লেখ করা হয় ।

সি. জি. এস. পদ্ধতিতে দীপনমাত্রার একক 'লাক্স' (LUX)। এক বর্গমিটার জায়গায় প্রতি সেকেন্ডে লম্বভাবে এক লুমেন আলো পড়লে, ঐ তলের দীপনমাত্রাকে বলা হয় 'লাক্স'। এই লাক্সকে 'মিটার-ক্যান্ডেল' বা লুমেন/বর্গমিটারও বলা হয় ।

আবার এক বর্গসেন্টিমিটার জায়গায় প্রতি সেকেন্ডে লম্বভাবে এক লুমেন আলো পড়লে, সেই তলের দীপনমাত্রাকে বলা হয় এক 'ফট' (PHOT)। 'ফট'কে লুমেন/বর্গসেন্টিমিটারও বলা হয় ।

সুতরাং —

১ লাক্স = ১ মিটার-ক্যান্ডেল = ১ লুমেন/বর্গমিটার

১ ফট = ১ সেন্টিমিটার-ক্যান্ডেল = ১ লুমেন/বর্গসেন্টিমিটার = $১০^{৪}$ লাক্স

১ ফুট-ক্যান্ডেল = ১ লুমেন/বর্গফুট = ১০.৭৬৪ লাক্স ।

উল্লেখযোগ্য যে, সূর্যের আলোয় আলোকিত প্রকৃতির দীপনমাত্রা প্রায় ৬০,০০০ ফুট-ক্যান্ডেল, আর পূর্ণিমা রাতে চাঁদের আলোয় আলোকিত প্রকৃতির দীপনমাত্রা মাত্র ১ ফুট ক্যান্ডেলের সমান ।

৪। ঔজ্জ্বল্য ঃ (Brightness)

আলোক উৎস আকারে বিস্তৃত হলে তার দীপনশক্তিকে ঔজ্জ্বল্য দ্বারা প্রকাশ করা হয় । উৎসের প্রতি-একক ক্ষেত্রফল থেকে কোন বিশেষ দিকে অভিলম্বভাবে প্রতি সেকেন্ডে যতটা আলো যায়, তাকে ঐ বিশেষ দিকে উৎসের ঔজ্জ্বল্য বলে। অর্থাৎ উৎসের প্রতি একক ক্ষেত্রে দীপনশক্তিকেই তার ঔজ্জ্বল্য বলে । অর্থাৎ **'অ'** ক্ষেত্রফলযুক্ত কোন উৎসের দীপনশক্তি **'দ'** হলে, তার ঔজ্জ্বল্য ঃ ($= \frac{(}{(}$

৫। দীপনমাত্রা সম্পর্কিত ব্যস্তবর্গের সূত্র ঃ (Inverse square law in connection with illuminance)

কোন উৎস থেকে কোন বিন্দুতে উৎপন্ন দীপনমাত্রা, ঐ বিন্দু ও উৎসের ভিতরকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক ।

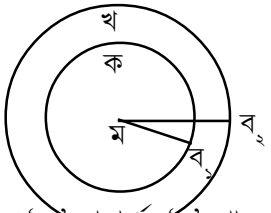

মনে করা যাক 'ক' এবং 'খ' দুটো গোলক । 'ব$_১$' ব্যাসার্ধের 'ক' গোলকের কেন্দ্র 'ম' উৎস থেকে প্রতি সেকেণ্ডে সমভাবে চারিদিকে 'অ' পরিমাণ আলো ছড়িয়ে পড়ছে । এই ক্ষেত্রে প্রথম গোলক 'ক'-এর ভিতরের পৃষ্ঠের কোন বিন্দুতে আলোর

দীপনমাত্রা **‘দ১’** ধরলে— $(_(= \frac{(}{(\pi(_(^2}((\pi(_(^2 = (((\,$ গোলকের ক্ষেত্রফল) ।

ব২ ব্যাসার্ধের **‘খ’** গোলকের ভিতরের পৃষ্ঠের কোন বিন্দুতে আলোর দীপনমাত্রা **‘দ২’** ধরলে—

$(_(= \frac{(}{(\pi(_(^2}((\pi(_(^2 = ((\,$ গোলকের ক্ষেত্রফল),

$\therefore \frac{(_(}{(_(} = \frac{(}{(\pi(_(^2}(/ \frac{(}{(\pi(_(^2}(= \frac{(_(^(}{(_(^2}$ অর্থাৎ $(\propto \frac{(}{(^2}$ এটাই ব্যস্তবর্গের সূত্র ।

এ ছাড়া দীপনমাত্রা ও দীপনশক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ দীপনমাত্রা = দীপনশক্তি/দূরত্বের বর্গ ।

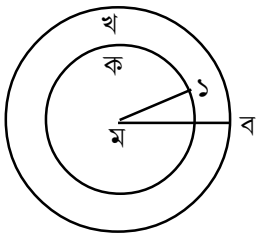

মনে করা যাক, দুটো সমকেন্দ্রিক গোলক ‘ক’ এবং ‘খ’ । এই দু টো গোলকের কেন্দ্রে ‘ম’ বিন্দুপ্রভব থেকে চারিদিকে সমভাবে ‘অ’ পরিমাণ আলো ছড়িয়ে পড়ছে । এবং ‘ক’ গোলকের ব্যাসার্ধ ১(এক একক) আর খ গোলকের ব্যাসার্ধ ‘ব’। ‘আ’ ম বিন্দুপ্রভবের দীপনশক্তি । এবং ‘দ’, ‘খ’ গোলকের ভিতরের পৃষ্ঠের কোন বিন্দুতে দীপনমাত্রা

$(= \frac{(\pi}{(\pi(^(} = \frac{}{(\pi(^(} = \frac{}{(^(} \quad ((\pi(^()$

.:আ $= \frac{(}{(\pi(((^2}($ ‘ক’ গোলকের ক্ষেত্রফল । অথবা অ = ৪ π আ

অ আ

অতএব ‘খ’ গোলকের ক্ষেত্রফল ঃ—

অর্থাৎ দীপনমাত্রা = দীপনশক্তি/দূরত্বের বর্গ

ফোটোমিতির মূলসূত্র ঃ—

দু’টো আলোর উৎস যদি কোন পর্দা বা তলের উপর সমান দীপনমাত্রা উৎপন্ন করে, তবে উৎস দু’টোর দীপনশক্তি পর্দা বা তল থেকে উৎসের দূরত্বের বর্গের সমানুপাতিক । ফোটোমিতির যন্ত্রে এই সূত্র প্রয়োগ করেই দীপনশক্তির তুলনা অথবা দীপনশক্তি মাপা বা নির্ণয় করা হয় ।

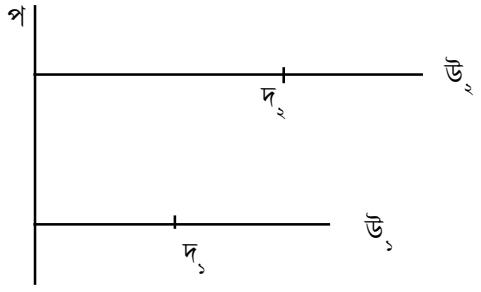

মনে করা যাক, দু'টো উৎস— উ$_১$ এবং উ$_২$ এবং উৎস দু'টোর দীপনমাত্রা যথাক্রমে অ$_১$, অ$_২$ আর উৎস দু'টো 'প' পর্দার উপর সমান দীপনমাত্রা সৃষ্টি করছে দ$_১$ এবং দ$_২$ দূরত্ব থেকে।

'প' পর্দার উপর প্রথম উৎস 'উ$_১$' এর দীপনমাত্রা, $= \frac{(_(}{(_(}$ এবং দ্বিতীয় উৎস 'উ$_২$' এর দীপনমাত্রা, $= \frac{(_(}{(_(}$

$$\therefore \frac{(_(}{(_(^2} = \frac{(_(}{(_(^2} = \frac{(_(}{(_(} = \frac{(_(^2}{(_(^2}$$

ফোটোমিতির ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। সেটা হল আলোর প্রতিফলনের পরিমাপ— আমরা জানি বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ফিল্মের উপর পড়লে ফিল্মের মধ্যে বস্তুর বিম্ব সৃষ্টি হয়, এটাই আলোকচিত্রের মূল বিষয়। তাই, আলো কোন্ মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে গিয়ে, কোন্ তলের উপর পড়ে, কতটা প্রতিসারিত, কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে—সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে।

সাধারণভাবে দেখা গেছে আলো বায়ুস্তরের মধ্যে দিয়ে সরাসরি অভিলম্ব ভাবে কাঁচের উপর পড়লে ৪.৫% এবং সমতল আয়নার উপর পড়লে ৮০% প্রতিফলিত হয়। এই প্রসঙ্গে আরও যা উল্লেখযোগ্য, আলো প্রতিফলক তলে যত বেশী কাৎ, তির্যকভাবে পড়বে, তত বেশী আলো প্রতিফলিত হবে।

দীপনশক্তি (ফুট-ক্যান্ডেল) = আলোর উৎসের তীব্রতা (ফুট-ক্যান্ডেল) / দূরত্ব^২ (ফুট)

দীপনশক্তি (লাক্স) = আলোর উৎসের তীব্রতা (ফুট ক্যান্ডেল) / দূরত্ব^২ (মিটার)

মীরিড মান = ১,০০০,০০০ / রঙের উত্তাপ (ডিগ্রি কেলভিন), = (১০^৬) / ডিগ্রি কেলভিন।

।। আলো ঃ আলোকায়ন ।।

আলোকায়নের নির্দিষ্ট কোন গাণিতিক পদ্ধতি নেই । আলোকায়ন সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে মাত্র। আলোকায়নের কতকগুলি নিয়ম অবশ্য সবার জানা উচিত । জেনে আবার ভুলে যাওয়াও উচিত । কারণ, ছবির থীম থেকেই ছবির আলোকায়ন পদ্ধতি গড়ে ওঠে ।

আমাদের চোখ একটা আশ্চর্য লেন্স । রঙিন পরিবেশে খুব খারাপ অবস্থাতেও চোখ স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে পারে। চোখ এমনি সংবেদনশীল যে, মোমবাতির আলো এবং এর থেকে কুড়ি হাজার গুণ শক্তিশালী সূর্যের আলোও আমরা একই ফ্রেমে দেখতে পাই । চোখ যেখানে এক হাজারটা আলোর স্তর বিভাজন করতে পারে, ফিল্মের আলোর স্তর বিভাজনের ক্ষ মতা একশোটা । সর্বাধুনিক ভিডিও ক্যামেরা আলোর স্তর বিভাজন করতে পারে তিরিশটা এবং সাধারণ ভিডিও ক্যামেরার আলোর স্তর বিভাজনের ক্ষ মতা মাত্র পনেরোটা !

আলোকায়নের উদ্দেশ্য ঃ—

১। ছবি তোলার জন্য দৃশ্যপট আলোকিত করা ।

২। শিল্পসম্মত ভাবে দৃশ্যপট উপস্থাপন করা ।

আলো ঃ—

প্রকৃতির আলোর উৎস সূর্য । কিন্তু ঘরে ঢুকলে আমরা দেখতে পাই দরজা জানালা দিয়ে আলো তো আসছেই, সেই আলো দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়েও ঘর আলোকিত করছে । অর্থাৎ ঘরের আলোর উৎস দুটো । প্রত্যক্ষ আলো । প্রতিফলিত আলো ।

১। প্রত্যক্ষ আলো—'কী-লাইট'।

এটা প্রধান আলো । বস্তুর গাঢ় ছায়া সৃষ্টি করে । ফলে বস্তু ত্রিমাত্রিক আকৃতি পায় ।

২। ভারসাম্য আলো—'ফিল-লাইট' ।

এটা গৌণ আলো । বস্তুর আলো-ছায়ার সমতা আনে এবং মৃদু ছায়া সৃষ্টি করে ।

৩। পশ্চাতের আলো, বা ডাইমেনশন লাইট—

এটা ছবিতে তৃতীয় মাত্রা সৃষ্টি করে । বিষয়বস্তুর পিছন দিক থেকে কী-লাইটের বিপরীত কোণ থেকে এই আলো ব্যবহার করা হয় ।

আলোর উত্তাপ ঃ—

রঙিন ফিল্ম সব আলোতে স্পর্শকাতর না । সঠিক রঙ ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ উত্তাপের আলো প্রয়োজন । 'আলোর উত্তাপ' 'ডিগ্রি কেলভিন' এককে মাপা হয় । ৩২০০° K উত্তাপের আলো রঙিন ফিল্ম-এর জন্য উপযুক্ত । মনে রাখা প্রয়োজন, যদিও বিভিন্ন উত্তাপের আলোতে ছবি তোলা যায়, তথাপি একাধিক উত্তাপের আলো মিশিয়ে ছবি তুললে রঙ ভাল ফুটে উঠবে না ।

১। সাধারণ দিনের আলোর উত্তাপ = ৫৫০০° K থেকে ৬৫০০° K (২৮০০° K থেকে ৮০০০° K)

(ডেলাইট ব্যালেন্স HMI, CSI, CID লাইট)

২। ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাসের আলোর উত্তাপ = ৬০০০° K

৩। টাঙ্গস্টেন হ্যালোজেন আলোর উত্তাপ = ৩৪০০° K

৪। ফোটোফ্লাড টাঙ্গস্টেন আলোর উত্তাপ = ৩২০০° K

৫। স্টুডিও টাঙ্গস্টেন আলোর উত্তাপ = ৩২০০° K

৬। ঘরের টাঙ্গস্টেন আলোর উত্তাপ = ২৮০০° K

আলোর চরিত্র এবং উজ্জ্বলতা ঃ—

টেনার ঃ— আলোকশক্তি ১০,০০০ ওয়াট । ঝকঝকে আলোর জন্য বিশাল স্পট ।

স্ট্যাণ্ডার্ড সিনিয়র ঃ— ৫০০০ ওয়াট । ভিতরে আছে ১৪ ইঞ্চি ফ্রেসনেল লেন্স । বড় সেট আলোকিত করার জন্য প্রয়োজন ।

ইঙ্কি-ডিঙ্ক ঃ— ফোকাসযুক্ত ছোট স্পট লাইট ।

বাশার ঃ— হাতে ধরে কাজ করা যায় । প্রয়োজনে ক্যামেরার উপর বসিয়ে শিল্পীর চোখে আলো দেওয়া হয় ।

বেবী ঃ— ২৫০ থেকে ৫০০ থেকে ওয়াটের বাল্বযুক্ত ।

মিগেট ঃ— ৫০ থেকে ২০০ ওয়াট আলোকশক্তি ।

ফ্লাড-লাইট ঃ— আলোর তীব্রতা স্পট লাইটের মত না । তবে অনেকটা জায়গা আলোকিত করতে পারে । চারকোনা **ইনডাইরেক্ট ফ্লাড-লাইট বোর্ডে—** ১০০০ ওয়াটের ৬টা বাল্বযুক্ত থাকে ।

কোন লাইট ঃ— ৭৫০ থেকে ৫০০০ ওয়াট । অনেকটা জায়গায় নরম আলো ছড়িয়ে দেয় ।

কোয়ার্ড লাইট ঃ— প্রতিফলকসহ ৫০০ ওয়াটের ৪-টে বাল্বযুক্ত । প্রত্যেকটা আলাদা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ।

বেল ল্যাম্প ঃ— ৫০০ থেকে ১৫০০ ওয়াট । আলো প্রতিফলিত করানো যায় ।

ব্রড লাইট ঃ— ২০০০ ওয়াট । পশ্চাৎপট আলোকিত করা কিংবা ছায়া মৃদু করার জন্য ব্যবহার করা হয় । অনেকটা জায়গায় সম-পরিমাণ আলোকিত করতে পারে ।

ডবল ব্রড লাইট ঃ—১০০০ থেকে ২৫০০ ওয়াট ।

সিঙ্গল ব্রড লাইট ঃ— ৫০০ থেকে ১৫০০ ওয়াট ।

স্কাইপ্যান ঃ— খুব জোরালো আলো দেয় । সেটের উপর থেকে কয়েকটা স্কাইপ্যান ব্যবহার করে অনেকটা জায়গা আলোকিত করা যায় ।

বেস লাইট ঃ— ছায়াতে নরম আলোর জন্য ব্যবহার করা হয় ।

ফোটোফ্লাড লাইট ঃ— অল্প জায়গা জুড়ে রাতের বেলা দিনের রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে । আয়ু কিন্তু ক্ষণস্থায়ী।

সানগান লাইট ঃ— আলো সূর্যের কিরণের মত । আউটডোর সুটিং -এ ব্যবহার করা হয় । হাতে ধরে ব্যবহার করা যায়।

আর্ক লাইট ঃ— বিশাল জায়গা জুড়ে সূর্যের মত আলোকিত করে ।

মোনার্ক লাইট ঃ— বিরাট আকার । স্টুডিওর সূর্য ।

ক্লীয়েগ লাইট ঃ— বিরাট আকার । অনেকটা জায়গা আলোকিত করে ।

ব্রুট লাইট ঃ— ২৫০০০ ওয়াট । আলোর তেজ রাগী লোকের মতই ।

মিনি ব্রুট ঃ— মিনি হলে কী হবে, সূর্যের আলোর মধ্যেও বাড়তি আলো দিতে পারে ।

আলোর প্রতিফলক ঃ—

যে কোন বাল্ব কোনও প্রতিফলক ছাড়া উৎসের চারদিকে সমান আলো ছড়ায় । আলোর উৎস যে কোন প্রতিফলকে স্থাপন করে আমরা আলোক রশ্মির দিক এবং উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ইচ্ছা মত ।

১। অর্ধবৃত্ত প্রতিফলক ঃ Parabolic reflector—এই ধরনের প্রতিফলক হার্ডলাইট থেকে নির্দিষ্ট কৌণিক তীব্র আলো প্রতিফলিত করে ।

২। নমনীয় প্রতিফলক ঃ Softlight reflector—এই ধরনের প্রতিফলক নমনীয় আলো থেকে বিস্তৃত আলো প্রতিফলিত করে ।

৩। কেন্দ্রবৃত্তাকার বা স্পট লাইট ঃ Spotlight—এই ধরনের প্রতিফলক হার্ডলাইট থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে অসম কৌণিক আলোর প্রতিফলন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।

বিভিন্ন ধরনের আলোকায়ন ঃ—

১। হার্ডলাইট ঃ— ছায়াঘন রূপসহ তীব্র আলো ।

২। সফট লাইট ঃ— নরম আলোয় উদ্ভাসিত স্নিগ্ধ পরিবেশ ।

৩। ব্যালেন্স লাইটিং ঃ— আলোর সামঞ্জস্যসহ মনোরম ছবি ।

৪। ফ্ল্যাট লাইটিং ঃ— যে ছবি আলোছায়া এবং নিকট দূরের পার্থক্যহীন ।

৫। কনট্রাস্ট লাইটিং ঃ— আলো-আঁধারের বৈষম্যসহ ছবি ।

৬। ক্রশ লাইটিং ঃ— বিষয়বস্তুর পাশ থেকে আসা আলো ।

৭। লাইন লাইটিং ঃ— পেছন দিক থেকে তীব্র আলো দিয়ে বিষয়বস্তুর প্রান্ত জুড়ে লাইটের লাইন সৃষ্টি করে ছবিকে আকর্ষণীয় করে তোলা ।

৮। ক্যারেকটার লাইটিং ঃ— চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে আলোকায়ন ।

৯। টপ-লাইটিং ঃ— চরিত্রের আই লেভেলের উপর থেকে আলো দেওয়া ।

১০। লো-লাইটিং ঃ— চরিত্রের চিবুকের তলা থেকে, কিংবা আই লেভেলের নিচ থেকে আলো দেওয়া ।

১১। রীম-লাইটিং ঃ— চরিত্রের জ্যোতির্ময় রূপ সৃষ্টি করার জন্য ১৮০° পিছন থেকে আলো দেওয়া।

১২। ফ্লেয়ার লাইটিং ঃ— চরিত্রের প্রান্ত জুড়ে আলোর দ্যুতি সৃষ্টি করা ।

১৩। শিলিউট লাইটিং ঃ— বিষয়বস্তুর পিছন দিকটা আলোকিত করে বিষয়বস্তুর কালো আকৃতি সৃষ্টি করা ।

১৪। হট স্পট ঃ— পরিবেশের বিশেষ জায়গায় জোরালো আলো দেওয়া ।

১৫। ডিমার এফেক্ট ঃ— আলোর সঙ্গে ডিমার যুক্ত করে আস্তে আস্তে আলো কমিয়ে বা বাড়িয়ে রাত থেকে দিন কিংবা দিন থেকে রাতের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা ।

আলোকায়নের ধারাবাহিকতা ঃ—

শট চলচ্চিত্রের একক । ক্লোজশটে চলচ্চিত্র মহিমান্বিত । তাই আলোর ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে প্রথমে ভাবতে হবে ক্লোজশটের বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্যের কথা । এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশের নির্দিষ্ট সময়ের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বিশ্বাসযোগ্যভাবে । কোন দৃশ্য বা ছবি হয়তো শুরু হয় 'লং শট' দিয়ে, আবার কোনটা শুরু হয় 'ক্লোজশট' দিয়ে । যে শট দিয়েই ছবি বা দৃশ্য শুরু হোক না কেন, প্রথম শটের পরিপ্রেক্ষিতেই আলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে । তা না- হলে আলোকায়ন বিশ্বাসযোগ্য হবে না ।

আলোকায়ন পদ্ধতি ঃ—

আলোকায়ন পদ্ধতি শুরু করা হয় চিত্রকর্মের লাইট, মিডিয়াম, ডিপটোন ব্যবহারের মত করেই 'কী', 'ফিল', ব্যাক লাইটিং-এর মাধ্যমে চিত্রনাট্যের অভিব্যক্তি, বিন্যাস অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের আলোকায়ন করে । কাহিনীচিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা, সত্যতার নেপথ্যে আছে স্থান-কাল-পাত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা । চলচ্চিত্রে স্থান-কাল-পাত্র বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে আলো, দৃষ্টিকোণ, ক্ষেত্রগভীরতা এবং চরিত্রের অভিব্যক্তির মাধ্যমে আলোর অভিব্যক্তি 'লো-কী' এবং 'হাই-কী'তে । 'কোডাক গ্রে স্কেল'-এর সাতটা স্তরের প্রথম চারটে স্তরের সমন্বয়ে 'হাই-কী' এবং শেষের চারটে স্তরের সমন্বয়ে 'লো-কী' আলোকচিত্রণ। মিডল

টোনে অবস্থান উভয় 'কী'র মধ্যেই আছে ।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নবরসের সমন্বয়ে আমাদের জীবনরস । 'লো-কী'র গভীর বৈষম্য, বৈপরীত্য, ডিপটোনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বীভৎস, রৌদ্র, বীর, অদ্ভুত, শৃঙ্গার রস । আর 'হাই-কী'র ফ্লাটনেস, লাইট টোনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্ত, বাৎসল্য, করুণ, হাস্য রস । মিডলটোনের মতই দৃষ্টিকোণ, আঙ্গিকের পরিপ্রেক্ষি তে বীর রসের অবস্থান হতে পারে উভয় 'কী'তে ।

ছবি তৈরির আগে যেমন চিত্রনাট্য লিখতে হয়, কোন ছবির আলোকচিত্রায়ণের জন্য প্রয়োজন হয় চিত্রনাট্য অনুযায়ী আলোকবিন্যাস বা 'লাইটস্কীম'-এর পরিকল্পনা । ছবির লাইটস্কীম কী হবে এটা নির্ভর করে মূলত চিত্রনাট্য এবং সিনেমাটোগ্রাফারের সৃজনশীলতার উপর । তাই 'লাইটস্কীম'-এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই ।

দুটো বিষয়কে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ছবির লাইটস্কীম—সেটের আলোর স্বাভাবিকতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নান্দনিকতা। স্বাভাবিকতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা-চরিত্র গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা যায়, কিন্তু নান্দনিকতা কল্পনানির্ভর, বিমূর্ত, সৃজনশীলতার অনন্ত আকাশ ।

বাস্তববাদী ছবির কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে স্বাভাবিক আলোকায়ন পদ্ধতি । স্বাভাবিক আলোকায়নের ভিত্তি আলোর উৎস, আলোর প্রকৃতি এবং বিম্বের উজ্জ্বলতা ।

প্রকৃতির আলোর উৎস দিনে সূর্য, রাতে চাঁদ । এর বিপরীত কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে কৃত্রিম আলো । কৃত্রিম আলো, সেটা ইলেকট্রিক বাল্ব, হারিকেন, কুপি, মশাল, মোমবাতি, আরও কত কী হতে পারে ।

চিত্রনাট্যের বিন্যাস অনুযায়ী যে সেটে চিত্রগ্রহণ করতে হবে সেটা নির্ধারিত হয়ে গেছে দিন না রাত্রির দৃশ্য এবং দিন-রাতের নির্দিষ্ট সময় । সুতরাং কৃত্রিম আলোর স্বাভাবিকতার জন্য প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে দিন-রাতের নির্দিষ্ট সময়ের আলোর উৎস এবং তার অবস্থান । রাতের প্রকৃতির নির্দিষ্ট আলো এবং অবস্থান প্রায় স্থির । চিত্রনাট্যের বর্ণনা অনুসারে সেটের পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে রাতের আলোর উৎস এবং অবস্থান । অর্থাৎ আলোর উৎস ইলেকট্রিক বাল্ব, হারিকেন, কুপি, মোমবাতি না মশাল । এবং সেটের কোথায় আলোগুলির অবস্থান । আলোর অবস্থান অনুসারে সেট আলোকিত করতে হবে এবং নির্ধারণ করতে হবে আলোছায়ার অনুপাত, কনট্রাস্ট রেশিও ।

দিনের যে বারো ঘন্টা সূর্য আকাশে থাকে, তার দ্বারাই সেট আলোকিত হয় । দিনের সূর্য কিন্তু আকাশে স্থির থাকে না, অর্ধচক্রাকারে (০° থেকে ১৮০°) পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায় । দিনের নির্দিষ্ট সময়ে আকাশে সূর্য কোন্ ডিগ্রিতে অবস্থান করছে, সেই অনুসারেই দিনের সেটের সূর্যের, হাই বা কী লাইটের অবস্থান হবে । এখানে আরও যা প্রাসঙ্গিক, লক্ষ্যণীয়, তা হলো সব বাড়িতে সূর্যের আলো সরাসরি ঢোকে না । অনেক বাড়ি সূর্যের প্রতিফলিত আলোয় আলোকিত । সুব্রত মিত্রের বাউন্স লাইট, স্বাভাবিক আলোকায়ন পদ্ধতির ক্ষে ত্রে যার কোন বিকল্প নেই ।

প্রত্যক্ষ আলোতে বস্তুর গাঢ় ছায়া এবং প্রতিফলিত আলোতে বস্তুর মৃদু ছায়া সৃষ্টি হয় । কোন নির্দিষ্ট সময় বা পরিবেশের আলোকায়ন করতে হলে যেমন আলোর প্রকৃতি এবং অবস্থান নির্বাচন করতে হয়, সেই সঙ্গে নির্ধারণ করতে হয় আলোছায়ার অনুপাত, কনট্রাস্ট রেশিও । আলোর উৎসই বলে দেবে প্রাকৃতিক না কৃত্রিম, দিন না রাত । আলোর অবস্থান বলে দেবে সেটের কতটুকু আলোকিত হবে, কতটুকু অন্ধকার থাকবে । আর আলোর উৎস, অবস্থান এবং আলোছায়ার অনুপাত, কনট্রাস্ট রেশিও-র সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে নির্দিষ্ট সময় । আর একটু এগিয়ে গিয়ে সেই বিমূর্ত কল্পনা—চিত্রনাট্যে আছে যার ইঙ্গিত—পরিচালক ও সিনেমাটোগ্রাফারের যা অভীপ্সা ।

আলোকায়ন ঃ—

স্বাভাবিক আলোকায়নের পদ্ধতির আর এক দিগন্ত, গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছায়া গোপন, ছায়া আড়াল করা । প্রকৃতির আলোর উৎস সূর্য, বস্তুর একটাই ছায়া ।

সেটের আকার-আকৃতি, লেন্স, এবং ফিল্মের ক্ষ মতার সীমাবদ্ধতার জন্য একটা মাত্র আলো দিয়ে সমস্ত সেট আলোকিত

করা যায় না । একাধিক আলো মানে একাধিক ছায়া । আবার যেহেতু সিনেমাটোগ্রাফি বাস্তবায়ন নয়, বাস্তবায়নকে অতিক্রম করে শিল্পায়ন, তাই প্রয়োজন একাধিক আলোর । অথচ দৃশ্যায়ন করতে হবে স্বাভাবিক আলোকায়নের মত । এটাই শর্ত, এটাই চ্যালেঞ্জ ।

একজন অভিনেতা জানালার কাছে বসে লিখছে । তার ডানদিকটা দেখছি আলোকিত, বাঁদিকটা দেখছি ছায়ার মধ্যে। ছায়া অংশের ডিটেলও দেখতে পাচ্ছি । কেননা আমাদের চোখ ১ ১০০০ আলোর স্তর বিভাজন দেখতে পারে । কিন্তু ফিল্ম আর ভিডিও তো দেখতে পারে মাত্র ১ ১০০, ১ ৩০ আলোর স্তর বিভাজন । এই কারণেই স্বাভাবিক দৃশ্যায়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত কনট্রাস্ট রেশিও অনুসরণ । অর্থাৎ কনট্রাস্ট রেশিওকে করতে হবে ১ ১০০ । অর্থাৎ বাঁদিকের ছায়া অংশকে আলোকিত করার জন্য ব্যবহার করতে হবে ফিললাইট । যে-ই ফিললাইট দেওয়া হলো, সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হলো 'কী' আর ফিললাইটের দু'টো ছায়া । বাস্তবে কিন্তু শুধু 'কী' লাইটের ছায়াটাই ছিল বা থাকে । কেননা, বাস্তবে দেওয়াল বা পরিপার্শ্বের অন্য কোন কিছুর থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আলোর বিপরীতের ছায়া অংশটা আলোকিত করে এবং আমাদের চোখের স্বাভাবিক ক্ষমতায় আমরা একই সঙ্গে আলোকিত ও ছায়া অংশের ডিটেলসহ দেখতে পাই । তাই স্বাভাবিক আলোকায়নের জন্য প্রয়োজন ফিললাইটের ব্যবহার । আবার যেহেতু দৃশ্যায়ন করতে হবে বাস্তবসম্মত, তাই আড়াল, গোপন করতে হবে ফিললাইটের ছায়া ।

একদা ১৯শে এপ্রিল-এর চিত্রগ্রাহক সুনির্মল মুজমদারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার কাজ কোনদিন সুব্রত মিত্রকে দেখিয়েছেন ?

—হ্যাঁ, দেখিয়েছিলাম । প্রথম কাজটা ।

কী বলেছিলেন ?

'অদ্ভুত কথা ! একটাই কথা—

''তুমি কোথায় কোথায় আলো বসিয়েছ আমি বুঝতে পারছি ।''

আর কিছু বলেননি ।'

একজন সিনেমাটোগ্রাফারের দক্ষতা চূড়ান্ত প্রকাশের প্রথম পদক্ষেপ আলোর উৎসের বাস্তবায়নে । বিশেষত ফিললাইটের অস্তিত্ব গোপনে, যেমন চিত্রকরের তুলির টান অস্তিত্ব হারায় রঙের সরগমে । যেমন, গায়কের সরগম বিলীন হয়ে যায় রাগ-রাগিনীর রূপ প্রকাশে নৈঃশব্দের অস্তিত্বে ।

চিত্রনাট্যে যেখানে লেখা আছে অন্ধকার, সিনেমাটোগ্রাফারের অভিধানে সেখানে লেখা আছে নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো। কারণ, সিনেমাটোগ্রাফি দৃশ্যশিল্প । সিনেমাটোগ্রাফিতে অন্ধকার নেই, আছে অন্ধকারের বিভিন্ন রূপ । চিত্রনাট্যকার যেখানে লিখেছেন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কেউ যাচ্ছে, সিনেমার পর্দায় দর্শক সেখানে দেখছে আলো-আঁধারের এক বিশেষ স্তরের মধ্যে চরিত্রকে । তবে আজকাল অবশ্য লোডশেডিং-এ সত্যিসত্যি পর্দা অন্ধকার হয়ে যায় ।স্বপন নায়েক, ক্যামেরাম্যান, প্রায় বলতেন, তাঁর সঙ্গে পরিচালকের মত মেলে না । পরিচালকের মতে লোডশেডিং-এ নাকি পুরো অন্ধকার হয়ে যায় ! কোন কিছু নাকি দেখা যায় না ! একদিন লোডশেডিং হয়েছে । তিনি হঠাৎ স্ত্রীকে বললেন—এই খানকি, এই মাগি, দেখ, লোডশেডিং-এ পুরো অন্ধকার হয়ে যায় ? কোন কিছু দেখা যায় না ? তবে টিভির ওই ছায়াটা আসছে কোত্থেকে ?

বলাই বাহুল্য যে, স্বপন নায়েকের কাছে জীবন, আলো, সিনেমা আলাদা ছিল না । আর স্ত্রীকে যে সম্বোধন করেছেন, সেগুলো নেহাতই জীবন যাপনের ক্ষোভ, ঘেন্না আর তীব্র ভালোবাসারই প্রকাশ । আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—আপনি ভালোবেসেছিলেন কেন ?

—'ওকে মা-মা মনে হয়েছিল ।'

অন্ধকারের বিভিন্ন রূপসৃষ্টিতে বিম্বের উজ্জ্বলতার ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । শুধুমাত্র অন্ধকারের বিভিন্ন রূপসৃষ্টিতেই নয়, বিভিন্ন সময়ের রূপসৃষ্টিতেও বিম্বের উজ্জ্বলতা, টোন রিপ্রোডাকশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

রাগ-রাগিণীর কেন্দ্রে যেমন দাঁড়িয়ে আছে স্বর, সিনেমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে সময়ের বিভিন্ন রূপসৃষ্টির কেন্দ্রে তেমনি

দাঁড়িয়ে আছে টোন । রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে যেমন শেষ সিদ্ধান্ত দেয় কান, সিনেমাটোগ্রাফিতে শেষ কথা বলে চোখ । সিনেমাটোগ্রাফির রাগ-রাগিণী, টোন-বিভাজন, অ্যানসেল অ্যাডমসের বিখ্যাত 'জোন সিস্টেম', যাকে আমি বলি 'আলোর সরগম' । আলোর 'সরগম'ই বলে দেয় ছবির সময় । রাগ-রাগিণী যেমন নির্ধারিত হয় ধ্বনির কম্পাংক দিয়ে, টোন রিপ্রোডাকশন নির্ধারিত হয় আলো, ফিল্ম স্পিড, ল্যাটিচুড এবং ডেভেলপমেন্টের সমন্বয়ে । যেই মুহূর্তে আমরা উচ্চারণ করছি টোন, জোন সিস্টেম, আলোর সরগম, সেই মুহূর্তেই আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে স্পর্শ করছি আলোকবিজ্ঞান এবং রসায়ন। অর্থাৎ আলো এবং ফিল্ম । লেন্সের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাপারচার, আর ফিল্মের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে ফিল্ম স্পিড, আলোর স্পর্শকাতরতা, উভয়ের সমন্বয়ে ফিল্ম ল্যাটিচুড, কারেক্ট এক্সপোজার । যার ফলশ্রুতি ডেভেলপমেন্ট । কারেক্ট এক্সপোজারের তাৎপর্য, গুরুত্ব এখানেই । কারেক্ট এক্সপোজারকে ভিত্তি করেই যাবতীয় টোন-রিপ্রোডাকশন করা হয় । ফিল্ম প্রস্তুতকারকরা আলোকবিজ্ঞানকে অবলম্বন করে এমন ভাবে ফিল্ম স্পিড নির্ধারণ করেছেন, যাকে ভিত্তি করে আমরা বুঝতে পারি কোন্ 'অ্যাপারচারে' কত 'ফুট ক্যান্ডেল' আলো ব্যবহার করলে কোন্ টোন সৃষ্টি হবে । কোন নির্দিষ্ট টোন সৃষ্টি করার জন্য নির্দিষ্ট ফিল্মে, নির্দিষ্ট পরিমাণ আলোতে, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ডেভেলপমেন্টে যে নির্দিষ্ট এক্সপোজার ব্যবহার করতে হয় তাকেই বলে 'কারেক্ট এক্সপোজার' । অনেকের মতে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সিনেমাটোগ্রাফার সুব্রত মিত্র তাঁদের একজন—যাঁদের কাছে 'কারেক্ট এক্সপোজার' শব্দটা অর্থহীন, ভিত্তিহীন । কেননা শুধুমাত্র এক্সপোজার পরিবর্তন করেই বিভিন্ন টোন সৃষ্টি করা যায়, তাই কারেক্ট এক্সপোজার বলে কোন কথা হতে পারে না । এই মতে বিশ্বাসীদের অনুরোধ করি, তাঁরা যে শুধুমাত্র এক্সপোজার পরিবর্তন করে বিভিন্ন টোন সৃষ্টি করছেন, সেটার ভিত্তি কী ? ফিল্ম প্রস্তুতকারকদের প্রদত্ত নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ ফিল্মের মান এবং ডেভেলপমেন্ট ছাড়া অন্য কিছু কি ? এই ক্ষে ত্রে আরও উল্লেখযোগ্য, আন্ডার এবং ওভার এক্সপোজার শব্দদু'টোর অর্থ কী ?

সৌম্যেন্দু রায় আমাদের জানাচ্ছেন, সুব্রতবাবু তাঁর কাজে বরাবরই নানাধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন । মার্চেন্ট আইভরি প্রোডাকশনসের 'দি গুরু' ছবির কিছু দৃশ্যের সুটিং হয়েছিল বেনারসে । প্রোসেসিং হয় লন্ডনের একটা ল্যাবরেটরিতে। ছবিতে বেনারসের গঙ্গার ঘাটে বিকেলের অল্প আলোয় তোলা একটা শট ছিল । শটটা লন্ডনের ল্যাবরেটরিতে পাঠানোর পর আন্ডার এক্সপোজড বলে রিপোর্ট আসে । সুব্রতবাবু এখান থেকেই শটটা নেবার পেছনে তাঁর পরিকল্পনা এবং শটটা প্রিন্ট করার জন্য তাঁর চাহিদা অনুযায়ী নির্দেশ পাঠালেন । সুব্রতবাবুর নির্দেশ মাফিক শটটার সঠিক প্রিন্ট করার পর রেজাল্ট দেখে ল্যাবরেটরির লোকেরাই অবাক হয়ে যান ।

আশা করি, অনুভবী পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ল্যাব রিপোর্টের 'আন্ডার এক্সপোজার', আমাদের অভিধানে 'কারেক্ট এক্সপোজার', সুব্রতবাবুর অভিধানে 'ক্রিয়েটিভ এক্সপোজার' । এই তিনটে এক্সপোজারের ভিত্তিই কিন্তু ফিল্ম স্পিড। আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলা যায় ফিল্ম ল্যাটিচুড ।

কারেক্ট নেগেটিভটা কী ?

সিনেমাটোগ্রাফির আর এক দিগন্ত 'মুড ফোটোগ্রাফি' । সেটের আলোর উৎস, স্বাভাবিকতা, বিশ্বাসযোগ্যতাকে অতিক্রম করে আরও কিছু । মুড ফোটোগ্রাফি মূলত কল্পনা নির্ভর—রেমব্রান্ট লাইটিং । যেখানে আলোর উৎসের, অবস্থানের বিশ্বাসযোগ্যতার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছবির, দৃশ্যের, চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবনা এবং সৌন্দর্য । তাই স্বাভাবিক বাস্তববাদী আলোকায়ন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সিনেমাটোগ্রাফার পাচ্ছেন স্বাধীন শৃঙ্খলার আর এক আকাশ, যাকে আমরা বলি কল্পনা, সৃজনশীলতা ।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে স্বাভাবিক, বাস্তববাদী আলোকায়ন পদ্ধতির বিপরীত কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে মুড ফোটোগ্রাফি, কিন্তু লাইটস্কীমের অন্তর্নিহিত সত্য—স্বাভাবিক, বাস্তববাদী আলোকায়ন পদ্ধতি এবং মুড ফোটোগ্রাফির সার্থক সমন্বয় । এইখানেই সিনেমাটোগ্রাফি ত্রিমুখী বিমূর্ত সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়া ।

শিল্পনির্দেশক, সিনেমাটোগ্রাফার, পরিচালক—পরস্পরের কাছে সমর্পিত, আবার ব্যক্তিত্বে, স্বাতন্ত্র্যে, শিল্পসৃষ্টির আর্তিতে উৎসর্গিত ইগো । শিল্প সাধনা, শিল্পানন্দ—অহং ত্যজ ঃ ।

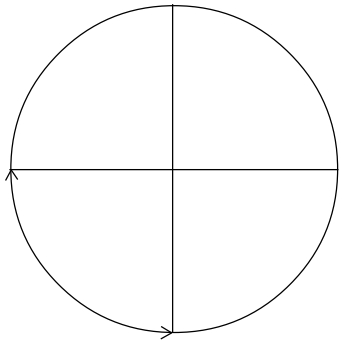

Key Light : 0^0 - 90^0

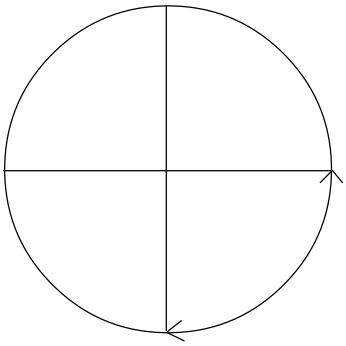

Fill Light : 360^0 - 270^0

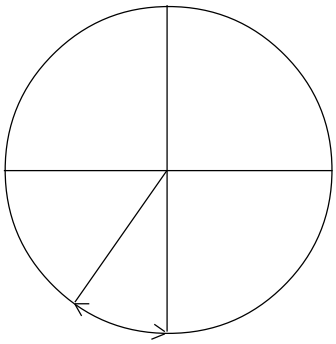

Front Key : 0^0 - 30^0

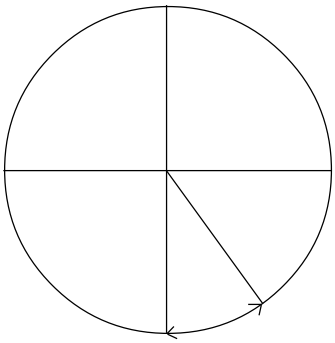

Front Fill : 360^0 - 330^0

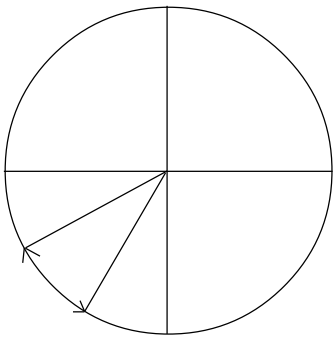

Three-Quarter key : 30^0 - 60^0

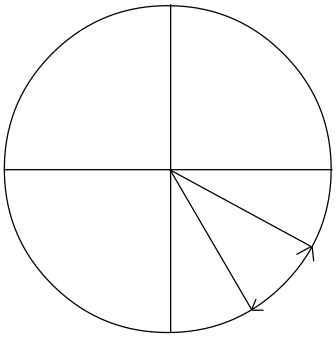

Three-Quarter Fill : 330^0 - 300^0

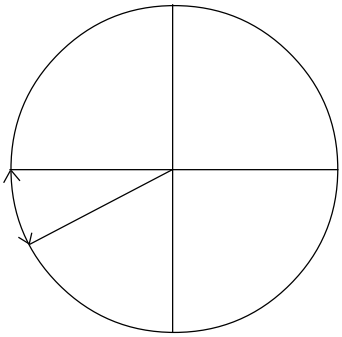

Side key : 60^0 - 90^0

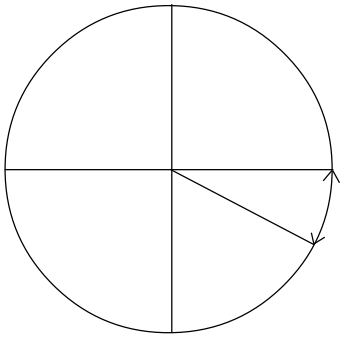

Side Fill : 300^0 - 270^0

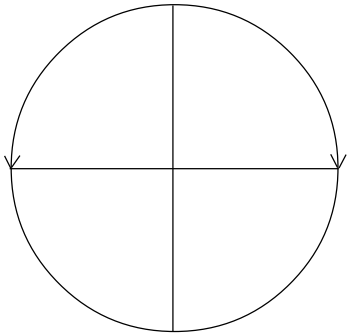

Dimension light : 90^0 - 270^0

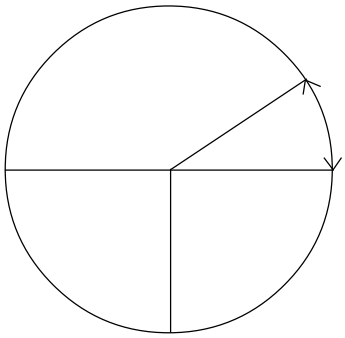

Right check/kick light : 270^0 - 225^0

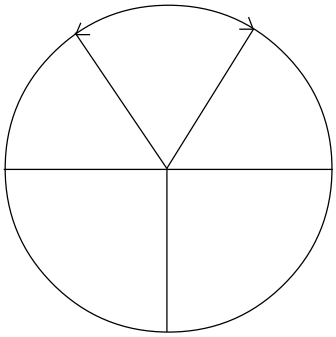

Back light : 160^0 - 200^0

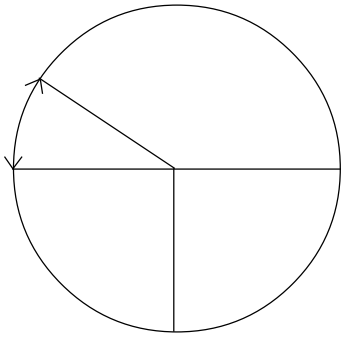

Left check/kick light : 90^0 - 135^0

Carbon arc lamp	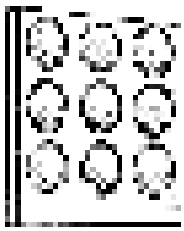 Mini-brute light	Metal halide lamp
"PAR" quartz lights	Fresnel Luminaire	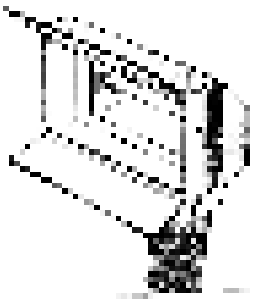 Swagus
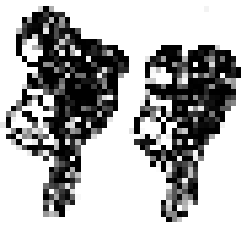 Movie lights	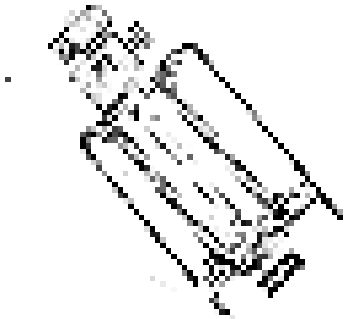 Quartz 'Tota-Light'	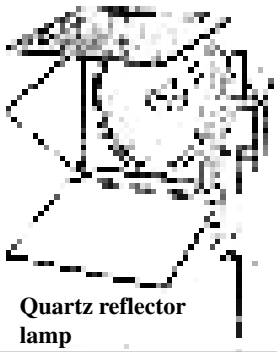 Quartz reflector lamp
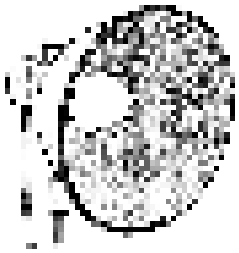 Flood light	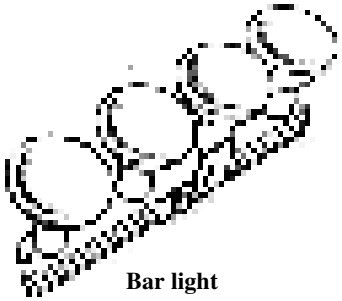 Bar light	Quartz softlight

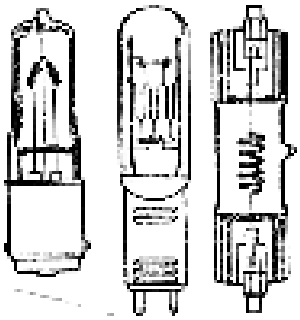

Quartz filament

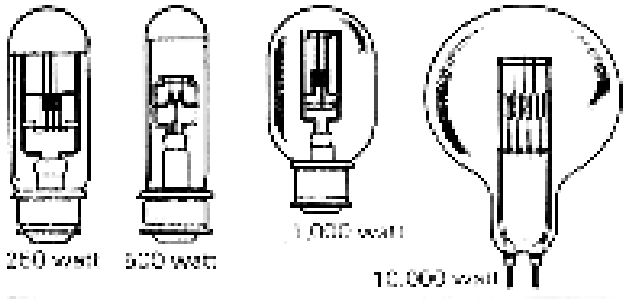

Tungsten filament

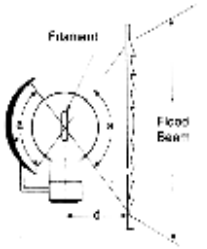

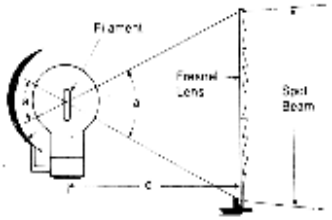

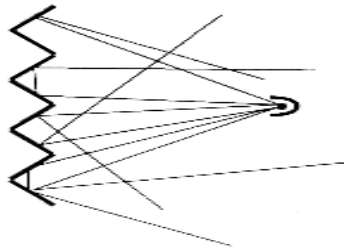

Sealed Beams

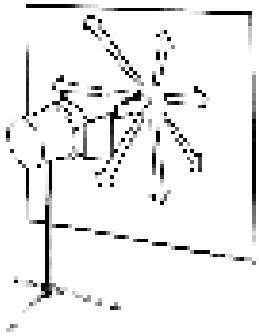

Bounced light

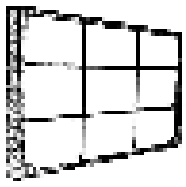

Diffuser

Scrim & half-scrim

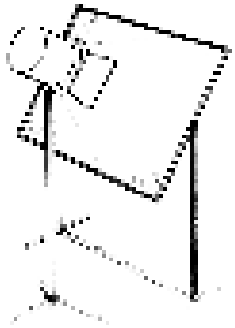

Diffused light

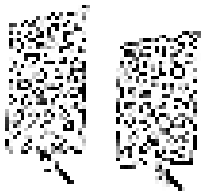

Cukaloris

Reflector

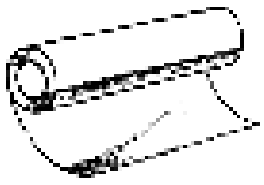

Window filter

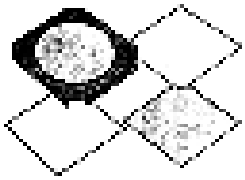

filter

।। দিনে রাতের দৃশ্যগ্রহণ ।।

সিনেমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে একটা অতিপ্রচলিত পদ্ধতি দিনে রাতের দৃশ্যগ্রহণ, —'ডে ফর নাইট' । একাধিক কারণে কখনও কখনও রাতের দৃশ্য দিনের স্বাভাবিক আলোয় তুলতে হয়, যাকে সিনেমাটোগ্রাফির ভাষায় বলে 'ডে ফর নাইট'—দিনে রাতের দৃশ্যগ্রহণ । সাদা-কালো এবং রঙিন—এই দুই ধরনের ফিল্ম দিয়েই দিনে রাতের চিত্রগ্রহণ করা যায় । তবে, উভয় ক্ষেত্রে পদ্ধতি কিন্তু আলাদা ।

সাদা-কালো ফিল্ম দিয়ে দিনে রাতের দৃশ্য তোলার জন্য দুটো ব্যবস্থা বা পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় ঃ—

১। ফিল্টার ব্যবহারের মাধ্যমে 'আন্ডারএক্সপোজার' পদ্ধতি ।

২। সরাসরি 'আন্ডারএক্সপোজার' পদ্ধতি ।

ফিল্টার ব্যবহার আন্ডারএক্সপোজড করা হয় দিনের খুব উজ্জ্বল আলোতে রাতের দৃশ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে । 'Wratten 25' গাঢ় লাল এবং 'Wratten 23' হাল্কা লাল ফিল্টার ব্যবহার করা হয় সাধারণত দিনের উজ্জ্বল আলো এবং আলো-ছায়াতে। উভয় ক্ষেত্রেই ফিল্টারের সঙ্গে সংযুক্ত 'ফিল্টার ফ্যাক্টর' এক্সপোজার কমিয়ে দেওয়া হয় । ফলে, শুধু ফিল্টারের কার্যকারিতা বেড়ে যায়, তাই নয়, দৃশ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খতা কমে গিয়ে সুন্দর রাত্রের বিভ্রম সৃষ্টি হয় ছবিতে।

একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে দিনে রাতের দৃশ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে আকাশ যতটা সম্ভব ফ্রেমে না-আনা বা আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে । মেঘমুক্ত নীল আকাশ দিনে রাতে দৃশ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে খুবই অসুবিধাজনক । যদি ফ্রেমের সামনের বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খতা দরকার হয়, তবে একটা নিরপেক্ষ আকাশ ফিল্টার—'Neutral wedge sky filter' ব্যবহার করে এই সমস্যা দূর করা যায় । বিশেষত যখন পিছন দিক থেকে আসা আলোয় (back light) চিত্রগ্রহণ করা হয় । পিছন দিক থেকে, বিশেষত যে-কোন এক পাশ থেকে আসা আলো, সাইডলাইট দিনে রাতের দৃশ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। ফ্রেমের বিষয়বস্তুগুলি হাফ'সিল্যুয়েড' বা আধাছায়াচ্ছন্ন হয় । অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খতা কমে যায়, যেটা স্বাভাবিক রাত্রের দৃশ্যে হয়ে থাকে । এটা সম্ভব হয়, কারণ, পিছনের আলোতে বা পাশের আলোতে আকাশ উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও আকাশের নীল রং 'Neutral wedge sky filter' গ্রাস করে ।

অনেক সিনেমাটোগ্রাফার দিনে রাতের দৃশ্যগ্রহণের সময় আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার জন্য 'পোলো স্ক্রীন ফিল্টার' (Polo screen filter) ব্যবহার করেন । কিন্তু সূর্যালোকে নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণের ক্ষেত্রে এই ফিল্টার ব্যবহার করা যায় না । বিশেষত প্যান শটের ক্ষেত্রে পোলো স্ক্রীন ফিল্টারের ব্যবহার তো প্রশ্নাতীত ।

দিনে রাতের দৃশ্যগ্রহণে লং শটে অভিনেতা/অভিনেত্রীর মুখের পুঙ্খাপুপুঙ্খতা দরকার হয় না । যেখানে দরকার ? গাঢ় লাল ফিল্টার কনট্রাস্ট বাড়িয়ে দেয় । ফলে, 'কী লাইট' —হাইলাইটের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে সামনের দিকটা চকচক করে এবং ছায়াচ্ছন্ন দিকটা খুব কালো হয়ে যায় । আলো ভারসাম্যাবস্থায় থাকে না । এই অসুবিধা দূর করার জন্য 'Wratten 23A' এবং 'Wratten 56' (হাল্কা সবুজ) ফিল্টার একসঙ্গে ব্যবহার করলে আলো-ছায়ার মধ্যে সমতা আসবে । এই ক্ষেত্রে আলাদাভাবে আন্ডারএক্সপোজার দরকার হয় না । দৃশ্য অনুযায়ী যেখানে দিনে রাতের দৃশ্যগ্রহণে আলোর উৎস দেখানোর সুযোগ আছে, সেখানে দৃশ্যকে বাস্তবসম্মত করার জন্যে কয়েকটা সাধারণ আলোর উৎস দৃশ্যের মধ্যে দেখানো যেতে পারে । তবে, এই

ক্ষেত্রে আলোর উৎসের উজ্জ্বলতা অবশ্যই দিনের আলোর উজ্জ্বলতা থেকে বেশি হবে এবং ফিল্টার ফ্যাক্টর অতিক্রম করে যথেষ্ট তীক্ষ্ণ হবে। ফলে, রাতের বিভ্রম অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়ে রাতের দৃশ্যের স্বাভাবিক রূপ ফুটে উঠবে । এই দৃশ্যগুলি সাধারণত গোধূলিতে, স্টুডিও-র ভাষায় 'ম্যাজিক লাইট' -এ তুললে ভালো ফল পাওয়া যায় । এই সময় দৃশ্যের সাধারণ এক্সপোজারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আলো থাকে এবং আন্ডারএক্সপোজার-এর জন্য কোন ফিল্টারের দরকার হয় না । অবশ্য যেখানে আকাশ দৃশ্যের অন্তর্গত, সেখানে একটা 'Neutral wedge filter' ব্যবহার করতে হবে । এই ক্ষেত্রে ফ্রেমে যে আলোর উৎসগুলো দেখানো হয়েছে সেখান থেকে অভিনেতা/অভিনেত্রীদের আলোকিত করে চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খতা বজায় রেখে সুন্দর রাত্রের দৃশ্য সৃষ্টি করা যায় ।

রঙিন ফিল্ম দিয়ে রাতের দৃশ্যগ্রহণ পদ্ধতি একটু আলাদা । এই ক্ষেত্রে রঙিন ফিল্টারগুলি কখনই ব্যবহার করা যাবে না। একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে যে রঙিন ছবির ক্ষেত্রে রাতের দৃশ্যগুলি হবে নীলাভ । ফলে, দিনে রাতের দৃশ্যগ্রহণে রঙিন ফিল্মের ক্ষেত্রে একটা বাড়তি সুবিধা এই যে, ৩২০০° কেলভিন ফিল্ম দিয়ে ৫৬০০° কেলভিন আলোতে ডে-লাইট ছবি তুললে স্বাভাবিকভাবে ছবিতে একটা নীলাভ আভা সৃষ্টি হয়ে রাতের বিভ্রম তৈরি করবে । রঙিন ফিল্মে দিনে রাতের দৃশ্যগ্রহণের সহজ পদ্ধতি রঙ সংশোধন ফিল্টার ছাড়া ৩২০০° কেলভিন ফিল্ম দিয়ে ৫৬০০° কেলভিন আলোতে সরাসরি আন্ডার এক্সপোজডকরে ছবি তোলা । ফিল্টার ব্যবহার না-করার ফলে সমস্ত দৃশ্যে নীলাভ আভা আসবে এবং আন্ডার এক্সপোজারের জন্য আলোর উজ্জ্বলতা, হাইলাইট কমে গিয়ে রাতের রূপ ফুটে উঠবে ।

দিনের আলোতে 'টাংস্টেন টাইপ রঙিন ফিল্মে' রাতের দৃশ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে যথার্থ রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য নীল আভা দূর করতে '৮৫' জাতীয় ফিল্টার ব্যবহার করলে ফিল্টার ফ্যাক্টরের জন্য এমনিতেই 'আন্ডার-এক্সপোজড' হয়ে রাতের দৃশ্যের বিভ্রম সৃষ্টি করবে । রঙিন 'ডে-লাইট টাইপ ফিল্ম' দিনে রাতের দৃশ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে 'HMI' লাইট (৫৬০০° কেলভিন) ব্যবহার করতে হবে। এই ক্ষেত্রে আন্ডার-এক্সপোজার প্রয়োজন । যদি 'HMI' লাইটের পরিবর্তে ৩২০০° কেলভিনের আলো ব্যবহার করা হয়, তবে আলোগুলিতে '৮০' জাতীয় নীল ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে ।

দিনে রাতের দৃশ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই । তবে, যে পদ্ধতিই অবলম্বন করা হোক না কেন, আন্ডার এক্সপোজারের উপর নির্ভর করতে হয় । $2\frac{}{2}$

দিনে রাতের দৃশ্যের সফল চিত্রগ্রহণ উপরে বর্ণিত নির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলির সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতেও হতে পারে । প্রত্যেকটা আলাদা দৃশ্যের সমস্যা, পরিবেশ, পরিস্থিতি অনুযায়ী পদ্ধতি নির্বাচন করাই দিনে রাতের দৃশ্যগ্রহণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় । এবং এটা সব সময়ই নির্ভর করে সিনেমাটোগ্রাফারের নিজস্ব রুচি, পছন্দ ও সৃষ্টিশীলতার উপর । তাই 'দিনে রাতের চিত্রগ্রহণ' বা 'ডে ফর নাইট'-এর আর এক দিগন্ত গ্রেডিং বা প্রিন্টিং ।

Filter	**Filter Factor**	**Stop**
Wratten - 25	7	$2\frac{2}{3}$
Wratten - 23A	4	2
Wratten - 56	6	

।। বর্ণালী ঃ বর্ণার্থ ।।

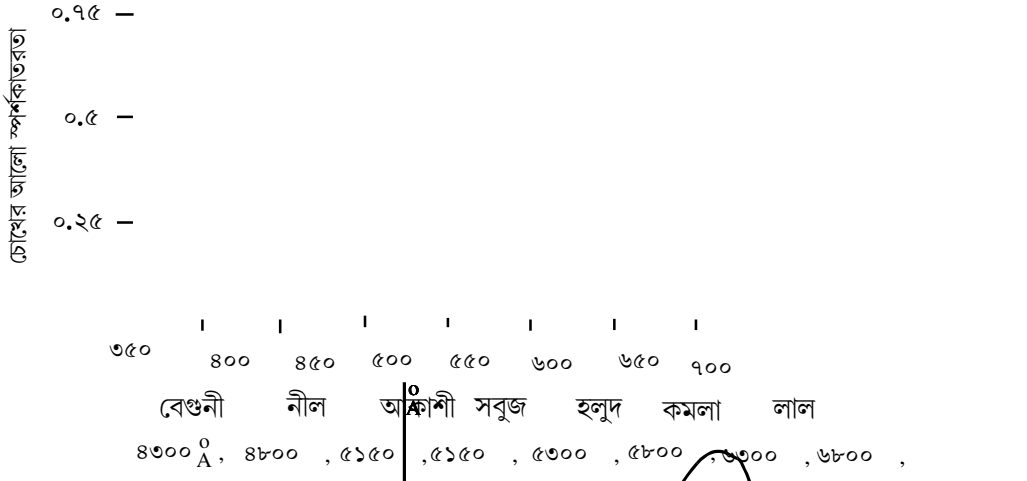

রঙ কীভাবে দেখি ?

উৎস থেকে আলো কিংবা বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখের অক্ষিপটে এসে পড়ে এবং আমরা দেখি । চোখের মধ্যে আছে রেটিনা । রেটিনার মধ্যে আছে আলোক-স্পর্শকাতর স্নায়ু । চোখের রেটিনার আলোকস্পর্শকাতর স্নায়ুর মধ্যে আছে রিডস এবং কোনসতন্ত্রী । আলোকের স্পর্শে রিডস আর কোনস বিদ্যুৎ তৈরি করে মস্তিষ্কে পাঠায় । রিডসগুলি খুব সামান্য আলোকেও সংবেদনশীল এবং বস্তুর নড়াচড়া ও আলোর তীব্রতার সামান্য কম-বেশী তীব্রভাবে উপলব্ধির সঙ্গে উজ্জ্বলতা পরিমাপ করে । আর কোনসগুলি তীব্র আলোতে অনুভূতিশীল এবং আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের মাধ্যমে রঙের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয় ।

মানুষের সব রকম আলোর অনুভূতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে । এই তিন ভাগ রঙকে মৌল রঙ বলে । আমাদের চোখের আলোকস্পর্শকাতর স্নায়ু, তিনটি দলের আলোকের বিভিন্ন অনুপাতের সংমিশ্রণে অন্য রঙগুলি দেখতে পারে । চোখের এই মিশ্রণ পদ্ধতিকে অ্যাডিটিভ মিশ্রণ বলে । এই মিশ্রণ অনুসারে রঙ্গিন টিভি পদ্ধতি চলছে । আর যৌগিক রঙের মিশ্রণকে সাবট্রাকটিভ মিশ্রণ বলে । ছবি আঁকার ক্ষেত্রে এই মিশ্রণ পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্যণীয় ।

অ্যাডিটিভ পদ্ধতিতে প্রাথমিক তিন রঙ—লাল, নীল এবং সবুজ । এই তিনটি রঙের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে সাদা রঙ এবং যে কোনও দুইটি রঙের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে অন্যান্য যৌগিক রঙগুলি । আবার যৌগিক রঙগুলির সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে কালো রঙ ।

বিজ্ঞানী গ্রাসম্যান-এর মতে, মানুষের চোখ রঙ-এর প্রাথমিক উপাদানগুলি বুঝতে পারে না কিন্তু প্রাথমিক রঙ-এর মিশ্রণে তৈরি যৌগিক রঙগুলি বুঝতে পারে—সাদা রঙ তিনটি মৌলরঙের সংমিশ্রণে তৈরি । তার জন্য সাদা রঙের পরিমাণ অনুযায়ী রঙের তীব্রতা পরিবর্তনশীল—এই সূত্র থেকেই অ্যাডিটিভ এবং সাবট্রাকটিভ মিশ্রণ পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাসম্যান তাঁর উপলব্ধি বুঝিয়েছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, ছবির মাধ্যমে ।

আলোকে পৃথিবী দৃশ্যমান । রং, বিভিন্ন শক্তির আলোরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ।

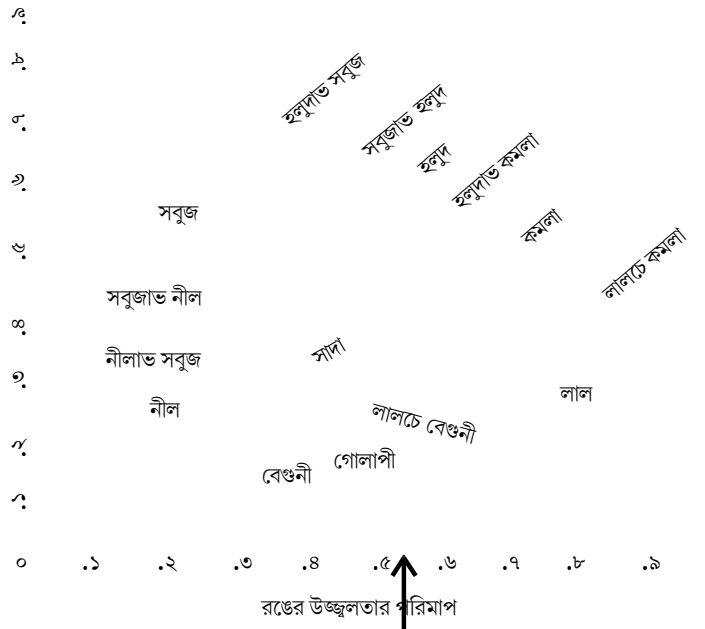

এক টুকরো লোহাকে ক্রমাগত গরম করতে থাকলে লোহাটা একসময়ে ফ্যাকাসে রক্তবর্ণ ধারণ করে ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, আকাশী, নীল, বেগুনি বর্ণ ধারণ করবে। এবং অবশেষে সাদা হয়ে যাবে । লোহা উত্তপ্ত হতে থাকলে কতকগুলি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক তরঙ্গ সৃষ্টি হয় । তরঙ্গগুলি মস্তিষ্কে আলোর তারতম্যের সংকেত সহ আলোর বর্ণের সংকেতও পাঠায় । ‘বর্ণ’কে ইংরাজীতে বলা হয় ‘‘Tint’’ এবং বর্ণক্রমকে বলে ‘‘Tone’’, বর্ণের বাংলা প্রতিশব্দ রঙ। আর বর্ণক্রম বলতে বোঝায় রঙের উজ্জ্বল অংশ থেকে অন্ধকার, ছায়া অংশের মধ্যে আলোর স্তর বিন্যাসকে। অর্থাৎ রংয়ের গাঢ়ত্ব এবং লঘুত্বের তারতম্যের স্তর বিন্যাস ।

আলোকচিত্র শিল্পের ব্যাকরণ অনুযায়ী বর্ণক্রমকে বলা হয়—টোনালগ্রেড [illegible] দিয়ে যাচাই করা হয় টোনালগ্রেড । ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানির ‘গ্রে স্কেল’ আলোর সরগমের স্তর [illegible] ৪, ১০, ১৮, ৩৮, ৬০, ৯৩, আলো-প্রতিফলনের শতকরা এই হার অনুযায়ী তৈরী হয়েছে । আলো আর আঁধারের মধ্যে ক’টা স্তর আছে, থাকবে—এটা বিতর্কিত। আমরা এই বিতর্ক শিল্পীর স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দিয়ে, স্বীকার করে নেব শুধু মাত্র আলো-আঁধারের স্তর বিন্যাসের কথা । সাধারণত সংগীতের আদি স্বর ‘সা-মা-গা’ কিংবা তন্ত্রশাস্ত্রের চিদাকাশ, চিত্তাকাশ, ভূতাকাশ কায়াসাধনার নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, রূপাশ্রয়, -এর মত চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও আলো-আঁধারের স্তর বিন্যাসের সংখ্যা তিনটে ধরা হয় । যেমন তবলার চামড়ার তিন স্তরের তিন রকম শব্দ ।

(১) বস্তুর উপর আলোকপাত হলে যে অংশ সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দেখায়, আলোকিত হয়ে ওঠে, সেই অংশকে বলা হয়, ‘হাইলাইট’, ‘সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল অংশ’ ।

(২) বস্তুর আলোকিত ও অন্ধকার অংশের মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় ‘মিডল্ টোন’,—‘মধ্যবর্তী অংশ’ ।

(৩) বস্তুর যে অংশের উপর আলোকপাত হয় না, অর্থাৎ প্রায় অন্ধকার থাকে সেই অংশকে বলা হয় 'সেড', —'ছায়া অংশ', 'ডার্কটোন' । এই ক্ষেত্রে 'সেড' এবং 'স্যাডো' শব্দ দু'টোর মধ্যে পার্থক্য বুঝে নেওয়া প্রয়োজন । স্যাডো, আলোর উৎসের সামনে কোনও অস্বচ্ছ বস্তু রাখলে তার বিপরীত দিকে অস্বচ্ছ বস্তুর অনুরূপ যে অন্ধকার আকৃতি সৃষ্টি হয়, সেটা । শিলুয়েট ছবির কথা মনে পড়ছে কি ?

রঙের স্তর বিন্যাসের একটা সুন্দর কবিতা লিখেছেন কবি বিনয় মুজমদার।

''গাছপালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
হঠাৎ খেয়াল হল সবুজ অনেক প্রকারের
হতে পারে । স্পষ্ট দেখি সব ক'টা গাছ যদিও সবুজ
তবুও তার প্রত্যেকটি গাছের বর্ণই আলাদা আলাদা
তার কোনটা ফিকে, কোনটা বা হলদে সবুজ
মেশালে যেমন হয় । ধূসর ও গাঢ় সবুজ রঙের মিশ্র রঙ
কোন কোনও গাছে
এই প্রকারের রঙে মনোরম চারিধার, আর আকাশে সাদা মেঘ ।''

আর একটা সুন্দর বর্ণনা 'ক্রমে নীচের উপত্যকা যেন মহাশূন্য থেকে দেখা দৃশ্য । পৃথিবীর দেহ স্পর্শ করে থেকেও যেন আমরা উড্ডীয়মান । নীচে সবুজ অতি সবুজ উপত্যকা । সবুজের যে কত সূক্ষ্ম বর্ণবৈচিত্র্য থাকা সম্ভব, এখানে না এলে তা উপলব্ধি করা যায় না । কচি কলাপাতা থেকে কালচে শ্যাওলা সবুজ—যেন সবুজ সুরের সারেগামা সাধা হচ্ছে । সজল সরল পরিপুষ্ট আগাছা নিবিড়তর পাইনের বন ।' 'অন্তিম সমস্যা'/অদ্রিকা দেবশর্মা ।

'সুরের, বর্ণের সারেগামা'—টোনালস্কেল দিয়ে ছবির কনট্রাস্ট বোঝা, মাপা যায় । কনট্রাস্ট শব্দের অর্থ—আলোছায়া, দু'টি ভিন্ন রঙের পার্থক্য ।

কবি রাঁবো লক্ষ্য করেছেন, কবিতার শব্দের ধ্বনির মধ্যে নানা রঙের বিচ্ছুরণ (এবং প্রত্যেকটি রঙ তাঁর চোখে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকী অর্থে দ্যুতিময় ।

গভীর রাতে হঠাৎ আপনার ঘুম ভেঙ্গে গেল । কালটা বসন্ত । আকাশে পূর্ণচন্দ্র । ফুরফুরে হাওয়া বইছে । দূরে কোথায় বিয়ে বাড়ির সানাই বেজে চলেছে । আপনার অভিজ্ঞ কান, শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে রাগ-রাগিণী, আলাপের ধরন, স্বরের গঠন বলে দিচ্ছে, কী রাগ বাজছে, কীভাব প্রকাশ করছে এবং সময়টা এখন রাত্রি কোন্ প্রহর । ছবির বর্ণ আমাদের বলে দেয় ছবিটা কোন ঋতুর, কোন সময়ের, কীভাবে প্রকাশ করছে । ছবির রং বোঝার ক্ষ মতা মানুষের জন্মগত । কেননা, প্রতিটা ঋতু, দিনের বিভিন্ন সময়ের আলোর তারতম্য মানুষের জীবনের নিত্যসঙ্গী । কিন্তু সঙ্গীত প্রকৃতির নির্বাচিত শব্দের ঐকতান । দীর্ঘদিনের কঠোর সাধনা ছাড়া 'সঙ্গীতের কান' তৈরী হয় না । স্বরের সঠিক গঠন, আলাপের যথার্থ নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা না হলে যেমন রাগ-রাগিণী ভাব প্রকাশে, রস সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়, তেমনি আলোকচিত্রের (ছবির) ক্ষেত্রেও বর্ণ ও বর্ণক্রমের সঠিক স্তর বিন্যাস যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে না পারলে ছবি আকর্ষণীয় হয় না, ভাব প্রকাশে, রস সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয় । ছবির বর্ণ আমাদের বলে দেয় ছবির সময়ের কথা । ভাবের কথা । রসের কথা ।

মূলত সঙ্গীত ও রঙের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য । প্রাচীন ও আধুনিক নন্দনতাত্ত্বিকরা রঙের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন সুরের ছোঁয়া । আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে সা—লাল, রে—কমলা, গা—পীত, মা—সবুজ, পা—আকাশী, ধা—নীল, নি—বেগুনি, এবং টোরি, তুষারের মত সাদা । বিলাবল, সবুজ । বারটি নীলাম্বরা । ভৈরবী, হলুদ, বসন্ত, নীল ইত্যাদি । রাজপুত রাগ-মালার ছবিও প্রকাশ করে সুরের মূর্ছনা । গম্ভীর শিবমূর্তি, ভৈরব রাগের চেহারা । শিবপূজায় মগ্ন বধূ, ভৈরবী । ব্রহ্মাপূজা, খাম্বাবতী । ঝুলনের দৃশ্য, হিন্দোল । মল্লযুদ্ধ, দেশাখ্যা । হোলির দৃশ্য, বসন্ত । নায়ক পুষ্পধনু থেকে তীর ছুঁড়ছেন, বিভাস । নায়িকা ময়ূরকে সঙ্গীত শোনাচ্ছে, গুর্জরী । বর্ষায় কৃষে(র লীলা, মেঘ । প্রায় প্রতিটা রঙিন ছবিতে ফুটে উঠেছে সুরের আমেজ।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞ এবং নন্দনতাত্ত্বিকরাও সুরের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন রঙের মাতামাতি । এবং গণিতজ্ঞরা আবার রঙের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন জ্যামিতিক আকার । বেটোফেনের 'পঞ্চম সিম্ফনি'র প্রথম আলেগ্রা অংশ নাকি কালো আর নীল-এর সংমিশ্রণ । 'কোরাল সিম্ফনি' নাকি উজ্জ্বল বেগুনি আর লালের আলোড়ন । চাইভস্কির 'লিটল্ রাশিয়ান সিম্ফনি'

নাকি হলুদ রঙের উপর আঁকা । বেল নিকলসন আর জ্যা বাজেনের ছবির মধ্যে নাকি শুনতে পাওয়া যায় জাজ সঙ্গীত। আবার নিকলসনের স্টীললাইফের মধ্যে নাকি শোনা যায় বাঁশির ফিকে সবুজ আর্তনাদ ! কোথায়ও বেলোর কালো কালো ঝংকার, কোথাও ট্রাম্পেটের ক্যাটক্যাটে হলদে চীৎকার ।

যদিও রঙের ভাষা আন্তর্জাতিক, তথাপি রঙ প্রতিটা দেশের নিজস্ব ঐতিহ্য, প্রথা অনুযায়ী বিশেষ ভাবের প্রতীক । ভারতীয়দের চিত্রাঙ্কণে বর্ণের সঙ্কেতাত্মক ব্যবহার লক্ষ্যণীয় । শিব সাদা ও ব্রহ্মা রক্তবর্ণ, বিষু(, রাম, কৃষ(-নীলবর্ণ । বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব হলুদবর্ণ, সরস্বতী সাদাবর্ণ । কালী কখনো কালো কখনও শ্যামা । প্রাচীন চীনদেশে বর্ণের সংকেতাত্মক ব্যবহার উল্লেখযোগ্য । চীনা শিল্পীরা লাল রং দিয়ে দক্ষিণ, কালো দিয়ে উত্তর, সবুজ রং দিয়ে পূর্ব, সাদা রং দিয়ে পশ্চিম দিক বোঝাতো। ইউরোপীয় দেশগুলিতে সাদা রং পবিত্রতা, হলুদ ঈর্ষা ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং লাল রং কখনও প্রেম, কখনো নিষ্ঠুরতার প্রতীক ।

অস্ট্রেলিয়ায় বিশেষ গোষ্ঠির কাছে লাল শয়তানের রং । কালো পার্শীয়ানদের কাছে মৃত্যুর প্রতীক । ঈজিপ্টে নীলরং আবার মৃত্যুর প্রতীক, রোমান ক্যাথলিকদের কাছে মৃত্যুর প্রতীক নীল এবং বেগুনি । অথচ নীল ও বেগুনি রং-এর পোশাক এবং কার্পেট সোনার চেয়েও দামী ।

রং ব্যবহারের সমস্যাটা শুধুমাত্র সৌন্দর্যের নয় । তার সঙ্গে জড়ানো রয়েছে মনস্তত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, জলবায়ু ও পরিবেশ। আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও রং-এর ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কপালে এবং পায়ের নীচে কাজলটিপ, শুভ পরিণয়ের নিমন্ত্রণপত্রের কোনায় হলুদ ও লাল সিঁদুরের ছোঁয়া, সন্ন্যাসীদের লাল ও গেরুয়া, বাউলদের গেরুয়া, বিধবাদের সাদা পোশাক বিশেষ অর্থবহ এবং প্রতীকধর্মী । আমাদের জাতীয় পতাকা ও রাস্তার পথনির্দেশক স্তম্ভের তিন রং-এর ব্যবহারও তাৎপর্যপূর্ণ । ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র পর্যালোচনা করলেই উপলব্ধি করতে পারবেন নবগ্রহ-রত্নের রং নাট্য শাস্ত্রকার ভরত বর্ণিত নব রসেরই দ্যোতক, এবং মৌল তিন রং সবুজ লাল নীল আমাদের মৌল তিন গুণ সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-র প্রতীক ভিন্ন অন্য কিছুই নয় । আবার তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী বিভিন্ন বর্ণ বা অক্ষ রের আছে নিজস্ব রং।

যদিও একটা সাদা-কালো আলোকচিত্র, ছবি, ফ্রেম দর্শককে প্রচুর কল্পনার সুযোগ দেয় । অর্থাৎ দর্শক নিজের ইচ্ছে মতো সাদা-কালো ফ্রেমে রং মাখিয়ে মনে মনে মন রাঙিয়ে ছবির রস আস্বাদন করতে পারেন, তথাপি প্রত্যেকটা রং-এর যে নিজস্ব সৌন্দর্য এবং মাধুর্য আছে সেটা আমরা কেউ অস্বীকার করবো না । রং সহজেই আমাদের দৃষ্টিকে নন্দিত করে চোখে মাখিয়ে দেয় সৌন্দর্যের কাজল ।

কতকগুলি ছবিতে সাদা এবং হাল্কা রং কিংবা লাইট টোনের প্রাধান্য থাকে । আলোকচিত্রে শিল্পের ব্যাকরণ অনুযায়ী এই ধরনের ছবিগুলি 'হাই কী' ছবি । সাধারণত ছবিগুলি দ্বিমাত্রিক । কনট্রাস্টহীন । কোমল শান্ত ভাব, মাধুর্য, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি মহৎ ও পবিত্র অনুভূতি নিয়েই ছবিগুলি তৈরী হয় । 'লো কী' ছবির চরিত্র ঠিক এর বিপরীত । কনট্রাস্টসহ ছবিগুলি ত্রিমাত্রিক । ছবিগুলিতে গাঢ় রঙের প্রাধান্য থাকে । ব্যর্থতা-শোক-বিষণ্ণতা হতাশা-জিঘাংসা-নিষ্ঠুরতা-কাঠিন্য ইত্যাদি অনুভূতি নিয়েই 'লো কী' ছবি ।

সত্যজিৎ রায় 'গুপীগাইন বাঘাবাইন' ছবির শেষ দৃশ্য হঠাৎ করে রঙিন করে এবং 'ঘরে বাইরে' ছবিতে বিমলার বিধবা হবার দৃশ্য হঠাৎ করে রঙ পাল্টিয়ে আমাদের অবাক করে দিয়েছিলেন । তাঁর মতে 'অশনি সংকেত' ছবিটা রঙিন করেছেন 'প্রকৃতি উর্বরা কিন্তু দুর্ভিক্ষ মানুষ' সৃষ্টি বোঝাতে । ছবিটা রঙিন না হলে এই কনট্রাস্ট নাকি ফোটানো যেতো না। আন্তোনিয়নির 'দি রেড ডেজার্ট' ছবিতেও আছে রঙের অদ্ভুত প্রয়োগ । কিসলোস্কি ফ্রান্সের জাতীয় পতাকার তিন রঙ লাল, নীল, সাদাকে অবলম্বন করে তৈরী করেছেন একটা ছবির সিরিজ—'থ্রি কালারস ট্রিলজি' হোয়াইট, ব্লু, অ্যান্ড রেড । ছবিগুলোতে রঙের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য । এছাড়া তাঁর 'এ শট ফিল্ম অ্যাবাউট কিলিং' ছবিতে রঙিন গোধূলী এবং নীল রঙের ব্যবহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । কুরোশেয়ার 'ডেডেস্কডেন' ছবিতেও আছে রঙের সুন্দর শৈল্পিক প্রয়োগ ।

রঙিন ছবিচিত্রের ক্ষেত্রে রং-এর প্রভাব অসীম । যেহেতু রং ব্যবহারে শিল্পী স্বাধীন, তাই শিল্পে রং এর প্রভাবের, ব্যবহারের কথা লিখে কোন মতেই শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না । সৃজনশীলতার অন্ত নেই ।

রঙ আলো রঙ শক্তি । রঙ দিগন্ত রঙ দূরত্ব । রঙ তরঙ্গ রঙ সুর । রঙ চঞ্চল রঙ গতি । রঙ আকৃতি রঙ বিমূর্ত । রঙ সৃষ্টি, রং অনন্ত ।

।। মেকবেথ কালার চেকার ।।

'মেকবেথ কালার চেকার' -এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং ছাপা ছবিতে রঙের সঠিক রূপান্তরের মান বিচার করা । অর্থাৎ রঙের মূল্যানুগত্য, যথার্থতা যাচাই করা ।

যদিও রঙের সঠিকত্ব নির্ভর করে মানুষের রুচি পছন্দের উপর, তথাপি 'মেকবেথ কালার চেকার' রঙের যথার্থতা বিচারে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে, তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে একটা সাধারণ মান নির্ধারণ করেছে ।

'মেকবেথ কালার চেকার' চব্বিশটা প্রাকৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক রঙের বর্গক্ষেত্রের সমন্বয়ে তৈরী । বিশাল রঙের জগৎ থেকে বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয়েছে এই চব্বিশটা প্রাকৃতিক রঙকে । যেমন মানুষের ত্বক, গাছের পাতা, নীল আকাশ । এই বর্গক্ষেত্রগুলো শুধুমাত্র রঙের সঠিকত্বই বর্ণনা করছে না, সেই সঙ্গে একইভাবে আলো প্রতিফলিত করছে বর্ণালীর দৃশ্যযোগ্য সব অংশের । এই কারণেই এই রঙিন বর্গক্ষেত্রগুলি যে-কোন ধরনের আলোর দ্বারা আলোকিত এবং যে কোন রঙিন পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়ে প্রাকৃতিক রঙের সঙ্গে চমৎকারভাবে মিলে যায় ।

মেকবেথ কালার চেকারে ত্বকের বর্ণ, বিশাল জনসংখ্যার গায়ের রঙের সমীক্ষার দ্বারা নির্ধারণ করা হয় নি, রঙের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই স্থির করা হয়েছে । অন্য বর্গক্ষেত্রগুলো প্রকৃতির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বর্ণালীর গুরুত্বপূর্ণ বর্ণক্রমের দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে । যেমন নির্দিষ্ট নীল ফুল, 'চিক্যারি' যেটা কোন কোন পদ্ধতিতে গোলাপী হিসাবে বর্ণিত হয়েছে । 'মেকবেথ কালার চেকার' সম্পূর্ণ করা হয়েছে নীল-সবুজ-লাল প্রাথমিক বর্ণসহ হলুদ-বেগুনী-আকাশী মিশ্র বর্ণ এবং সাদা-কালোর স্বাভাবিক স্তর বিভাজনের সমন্বয়ে ।

যে কোন রঙিন উৎপাদন, রূপান্তর যাচাই করার সহজতম পদ্ধতি হলো—'মেকবেথ কালার চেকার'-এর সঙ্গে তুলনা করা । এই তুলনা দৃশ্যগত হতে পারে আবার বৈজ্ঞানিক ভাবেও হতে পারে । কারণ, মেকবেথ কালার চেকারের প্রতিটা রঙিন বর্গক্ষেত্রের ঘনত্বের পরিমাণ দেওয়া আছে । সুতরাং রঙিন উপাদানকে ডেনসিটোমিটার দিয়ে মাপলেই তার মান বোঝা যাবে।

'মেকবেথ কালার চেকার' কপি করার সময় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন । মেকবেথ কালারের উপর বিভিন্ন রকম আলো আসতে পারে । পাশের বস্তুর আলো প্রতিফলিত হতে পারে । ক্যামেরার লেন্সেরও আছে বিশেষ রঙ, বিশেষ ধরনের ডেভেলপার, বিশেষ ধরনের যন্ত্র, বিশেষ ধরনের ফিল্ম, কালি (ছাপার ক্ষেত্রে) এমন কি প্রিন্ট দেখার প্রোজেকটার এবং ভিউয়ারের প্রকৃতিও মেকবেথ কালার চেকার-এর কপির উপর প্রতিক্রিয়া করে । তাই 'মেকবেথ কালার চেকার' কপি করার সময় এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন । এই বিষয়গুলোর যে কোন একটার প্রতিক্রিয়ার ফলেই কিন্তু সঠিক রঙিন কপি পাওয়া যাবে না ।

চলচ্চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে 'মেকবেথ কালার চেকার' ব্যবহার পদ্ধতি ঃ—

১। স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম উভয় প্রকার আলো দিয়ে প্রথমে চেকারের ছবি তুলে দেখতে হবে । এবং উভয় প্রকার আলো 'মেকবেথ কালার চেকার'-এ কী ধরনের প্রতিক্রিয়া করছে সেটা নির্দিষ্ট ফিল্টার ব্যবহার করে সমতা আনতে হবে।

২। দু'টো ভিন্ন ধরনের ট্রান্সপারেন্সিতে ছবি তুলে ডেনসিটোমিটার দিয়ে ট্রান্সমিশন ডেনসিটির পার্থক্য বিচার করতে হবে ।

৩। স্বাভাবিক আলোতে দু'টো ভিন্ন ধরনের ফিল্মে ছবি তুলে তার তুলনা করতে হবে । বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার জন্য স্লাইডের সঙ্গেও তুলনা এবং ডেনসিটোমিটার দিয়ে মাপতে হবে ।

ভিডিও ছবির ক্ষেত্রে 'মেকবেথ কালার চেকার' ব্যবহার পদ্ধতি ঃ—

১। প্রথমে নির্দিষ্ট আলোকায়নে 'মেকবেথ কালার চেকার'কে ফ্রেম করে বিভিন্ন ক্যামেরা এবং মনিটরগুলোর মধ্যে যতটা সম্ভব সমতা আনতে হবে । এই ক্ষেত্রে অসংশোধনীয় সূক্ষ্ম পার্থক্য মনিটরে দেখা যাবে ।

ছাপাছবির ক্ষেত্রে 'মেকবেথ কালার চেকার' ব্যবহার পদ্ধতি ঃ—

১। প্রথমে একই মানের রঙ দিয়ে বিভিন্ন রঙিন বস্তুর প্লেট তৈরী করে কাগজে ছাপতে হবে । তারপর নির্দিষ্ট মানের দৃশ্যযোগ্য অবস্থায় ঐ ছাপাছবি আসল মেকবেথ কালার চেকারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে এবং প্রতিফলিত ঘনত্ব মাপতে হবে ।

Technical Data

Colour names and specifications are given in the table below. The chromaticity co-ordinates x and y, and the luminous reflectance factor Y are based on the system of colour measurement adopted by the 'International Commission on Illumination' (CIE) in 1931, relative to CIE Illuminant C. The Munsell notations in terms of hue, value and chroma are colour descriptions widely used by artists, designers and colour technologists. The ISCC-NBS names are designated by a method established by the Inter-Society Colour Council and the National Bureau of Standards of the USA. The assigned names are either names of natural objects spectrally simulated, names of subtractive primaries (yellow, magenta and cyan). Munsell names (for the gray series), or abbreviated ISCC-NBS names.

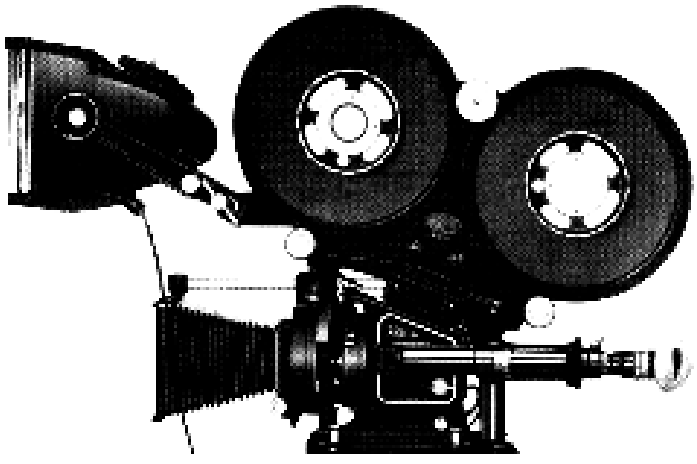

ARRIFLEX35 for 1000 ft magazine

Colour names and specifications.

No.	Names	CIE (1931) x	y	Y	Hue	Munsell Notation Value/ Chroma	ISCC/NBS Name
1.	dark skin	400	350	10.1	3YR	3.7/3.2	moderate brown
2.	light skin	377	345	35.8	2.2 YR	6.47/4.1	light reddish brown
3.	bule sky	247	251	19.3	4.3 PB	4.95/5.5	moderate blue
4.	fohage	337	422	13.3	6.7 GY	4.2/4.1	moderate olive green
5.	blue flower	265	240	24.3	9.7 PB	5.47/6.7	light violet
6.	bluish green	261	343	43.1	2.5 BG	7/6	light bluish green
7.	orange	506	407	30.4	5 YR	6/11	strong orange
8.	purplish blue	211	175	12.0	7.5 PB	4/10.7	strong purplish blue
9.	moderate red	453	306	19.8	2.5 R	5/10	moderate red
10.	purple	285	202	6.6	5P	3/7	deep purple
11.	yellow green	380	489	44.3	5 GY	7.1/9.1	strong yellow green
12.	orange yellow	473	438	43.1	10 YR	7/10.5	strong orange yellow
13.	blue	187	129	6.1	7.5 PB	2.9/12.7	vivid purplish blue
14.	green	305	478	23.4	0.25 G	5.4/8.65	strong yellowish geen
15.	red	539	313	12.0	5 R	4/12	strong red
16.	yellow	448	470	59.1	5 Y	8/11.1	vivid yellow
17.	magenta	364	233	19.8	2.5 RP	5/12	strong reddish purple
18.	cyan	196	252	19.8	5 B	5/8	strong greenish blue
19.	white	310	316	90.0	N	9.5/	white
20.	neutral 8	310	316	59.1	N	8/	light gray
21.	neutral 6.5	310	316	36.2	N	6.5/	light medium gray
22.	neutral 5	310	316	19.8	N	5/	medium gray
23.	neutral 3.5	310	316	9.0	N	3.5/	dark gray
24.	black	310	316	3.1	N	2/	black

।। চিত্রকলার আলোকে সিনেমাটোগ্রাফি ।।

সিনেমাটোগ্রাফি একটা দৃশ্যকলা । দৃশ্যকলার ঐতিহ্য চিত্রকলা । চিত্রকলার বয়স হাজার-হাজার বছর । আলোকচিত্রের বয়স মাত্র দেড়শ বছর । আর সিনেমাটোগ্রাফি ১৯৯৫ সালে একশ বছরে পা দিয়েছে । তাই, সিনেমাটোগ্রাফিকে খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রভাবিত করেছে দৃশ্যকলার জনক, ঐতিহ্য, আদি প্রকাশ মাধ্যম—চিত্রকলা ।

চিত্রকলার একটা উপাদান রঙ । সিনেমাটোগ্রাফির একটা উপাদান আলো । রঙ বিভিন্ন উত্তাপের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোরই প্রকাশ । সিনেমাটোগ্রাফি জন্মলগ্ন থেকেই দ্বিমাত্রিক তলে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মতো ত্রিমাত্রিক । কিন্তু রেনেসাঁর পূর্ববর্তী চিত্রকলা ছিল মূলত দ্বিমাত্রিক । রেনেসাঁ চিত্রকলা আলোর অভিনব প্রয়োগে, কিয়ারাস্কুরোয় হয়ে উঠল ত্রিমাত্রিক। এই রেনেসাঁর সর্বাধুনিক ফসল আলোকচিত্র—সিনেমাটোগ্রাফি ।

সিনেমাটোগ্রাফির জন্মলগ্নের পথপ্রদর্শক রেনেসাঁ চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নাটক এবং পঞ্চাশ বছরের স্থির আলোকচিত্রের ইতিহাস । নাটকের মঞ্চচিত্রণ এবং আলোকায়ন পদ্ধতিও প্রভাবিত হয়েছিল রেনেসাঁ চিত্রকলার আঙ্গিকে, প্রকাশভঙ্গিতে । শুরুতে চলচ্চিত্র দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল নাটকের প্রকাশভঙ্গিতে । একশ বছরেও সে প্রভাব ত্যাগ করতে পারেনি চলচ্চিত্র । বিশুদ্ধ চলচ্চিত্রের জন্য আমাদের আরও অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে । তবে, অনেক বছর আগেই নাটকের আলোকায়ন পদ্ধতির প্রভাব অতিক্রম করে নিজস্বতা অর্জন করেছে সিনেমাটোগ্রাফি । আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিক নাটকের আলোকায়ন পদ্ধতির প্রবণতা আধুনিক সিনেমাটোগ্রাফির স্বাভাবিক আলোকায়ন পদ্ধতির দিকে ।

যদিও চলচ্চিত্রের জন্মলগ্নে লুমিয়ে ভাইরা তুলেছিলেন দৈনন্দিন স্বাভাবিক দৃশ্য, কিন্তু চলচ্চিত্রকে ক্রমেই আকর্ষণ করল সাহিত্যের কাহিনী, নাটকীয় সংঘাত ।

স্বাভাবিকভাবেই চলচ্চিত্র চলে গেল নাটকের কাছাকাছি । তৈরি হলো স্টুডিও । চিত্রগ্রহণে কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন হলো। নাটকের আলোকায়ন পদ্ধতি চলচ্চিত্রে প্রভাব বিস্তার করল । কিন্তু এক সময় চলচ্চিত্রে নাটকের এই চড়া আলো, চড়া রূপসজ্জা, চড়া অভিনয় কারো আর পছন্দ হচ্ছিল না । কেননা, চলচ্চিত্রের জন্মলগ্নেই প্রমাণিত হয়ে গেছে চলচ্চিত্রের স্বাভাবিক জীবনকে প্রকাশ করার ক্ষমতা । তাই, চলচ্চিত্রকে স্বাভাবিকতার দিকেই এগিয়ে যেতে হলো । এটাই রেনেসাঁর ফসল । ইতিমধ্যে সাহিত্য ও চিত্রকলা যেদিকে এগিয়েছে তা ন্যাচারালিজম ও রিয়েলিজমকে অবলম্বন করে । এই কারণেই ন্যাচারালিজম, রিয়েলিজম খুব তাড়াতাড়ি স্টুডিওর মধ্যে ঢুকে গেল । প্রভাবিত করল চলচ্চিত্রকে ।

চলচ্চিত্রে স্বাভাবিক আলোকায়নের জন্য সিনেমাটোগ্রাফারের সামনে ছিল চিত্রকলার 'কিয়ারাস্কুরো', আলো-ছায়ার পরম্পরা এবং পঞ্চাশ বছরের স্থির আলোকচিত্রের নিদর্শন । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রের আঙ্গিকও প্রভাবিত করেছে চিত্রশিল্পীদের । কয়েকজন চিত্রশিল্পীর ছবিতে আছে চলচ্চিত্রের গতিময়তাকে ধরার প্রয়াস এবং কম্পোজিশনে চলচ্চিত্রের 'এজ কাট' ফ্রেমের আভাস ।

চলচ্চিত্রের আলোকায়ন পদ্ধতির মধ্যে দু'টো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যায় । নাটকীয় আলোকায়ন পদ্ধতি এবং স্বাভাবিক আলোকায়ন পদ্ধতি । চিত্রশিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুই পদ্ধতি প্রভাবিত হয়েছে মূলত রেমব্রান্ট (১৬০৬-৬৯) এবং ভারমেয়ার (১৬৩২-৭৫) -এর চিত্রকলার দ্বারা ।

হটস্পট, হার্ডলাইটিং, টপলাইটিং, লো লাইটিং, রীম লাইটিং, ফ্লেয়ার লাইটিং, ক্যারেকটার লাইটিং, ক্রশ লাইটিং—চলচ্চিত্র এই বিচিত্র নাটকীয় আলোকায়ন পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে রেমব্রান্টের চিত্রকলা থেকে ।

রেমব্রান্টের বেশিরভাগ ছবিতে আলোর কোন স্থির উৎস নেই, নেই আলোর ঔজ্জ্বল্যের কোন ধারাবাহিকতা। কিন্তু সমস্ত ছবি জুড়ে রয়েছে ছবির ভাব এবং চরিত্র অনুযায়ী রেমব্রান্টের নিজস্ব এক অপূর্ব আলো। যে আলো ছবিকে করেছে আকর্ষণীয়, মনোগ্রাহী, নাটকীয়, এবং তাৎপর্যপূর্ণ। রেমব্রান্ট অনেক ছবির মধ্যে আলোর স্বাভাবিক উৎসের কথা চিন্তা করেন নি। প্রয়োজনে ছবির যে কোন অংশ আরোপিতভাবে আলোকিত করে, উজ্জ্বল করে দৃষ্টিগ্রাহ্য করেছেন মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য। রেমব্রান্টের বেশির ভাগ ছবিতে আছে তীব্র কনট্রাস্ট লাইটিং 'লো-কী'র অনবদ্য ব্যবহার। আর তাঁর আঁকা প্রতিকৃতিতে ব্যবহৃত হয়েছে একটা সুনির্দিষ্ট আলোকায়ন পদ্ধতি, একটা ঘরাণা। যেটা সিনেমাটোগ্রাফিতে 'রেমব্রান্ট লাইটিং' নামে পরিচিত, স্বীকৃত। উল্লেখযোগ্য, রেমব্রান্টের সমগ্র চিত্রকলার মধ্যেই আছে আধুনিক সিনেমাটোগ্রাফির আলোকায়ন পদ্ধতির যাবতীয় স্বরূপ।

শিল্পরসিকদের ধারণা, প্রথম স্বাভাবিক আলো-ছায়ার ব্যবহারের প্রমাণ বহন করছে 'ইয়ান ভ্যান আইক' (১৩৯০-১৪৪১) -এর 'জোভান্নি আর্নলফিনি ও তাঁর স্ত্রী' ১৪৩৪ সালের ছবিটা। চলচ্চিত্রের আলোকায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে ছবিটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। লক্ষ্যণীয়, ছবিতে ঘরের মধ্যে বাঁদিকের জানালার সামনে জোভান্নি ও তাঁর স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন হাত ধরাধরি করে। জোভানি তাঁর স্ত্রীকে কিছু বোঝাচ্ছেন। মেঝেতে তাঁদের বিলাসী কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। খুব সাধারণ ঘরোয়া দৃশ্য। জোভান্নি ডান হাত তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে কিছু বলছেন, স্ত্রী জোভান্নির দিকে তাকিয়ে কথাগুলি বুঝতে চেষ্টা করছেন। আলোছায়া এবং স্বাভাবিক আলোকায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে যে দুটো বিষয় উল্লেখযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো ছবিতে আলোর উৎস থেকে দূরত্ব অনুযায়ী আলোর ঔজ্জ্বল্যের ধারাবাহিকতা বা তারতম্য বজায় রাখা হয়নি। জোভান্নির মুখের ঔজ্জ্বল্য এবং তাঁর স্ত্রীর মুখের ঔজ্জ্বল্য একই আছে, বেশি-কম হওয়া উচিত ছিল। কেননা, জোভান্নির স্ত্রী আলোর উৎস থেকে জোভান্নির চেয়ে বেশি দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু দু'জনের পোশাকে চমৎকার আলোর ঔজ্জ্বল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে এবং জোভান্নির মুখের বাঁদিকে স্বাভাবিক ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে। আবার ছবির পশ্চাৎপটে হঠাৎ করে হটস্পট করা হয়েছে। ছবিতে ত্রিমাত্রিক, ডাইমেনশন সৃষ্টি করার জন্য।

এই যে ছবিতে জোভান্নি ও তাঁর স্ত্রীকে সমান ঔজ্জ্বল্যে আঁকা হয়েছে, বুঝিবা এটা আধুনিক 'সিনেমাটোগ্রাফিক লাইসেন্স'— নায়িকাকে সুন্দর করার বিশেষ একটা প্রবণতা। 'নায়িকাকে কেউ কুৎসিত দেখতে চায় না!'—এই মনোভাব কি পুরুষতান্ত্রিক, নাকি বাণিজ্যিক?

রেনেসাঁ চিত্রকলার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম 'ভারমেয়ার'-এর ছবি। ভারমেয়ার-এর ছবি এতই স্বতন্ত্র যে, ভাবতে অবাক লাগে কী করে এটা সম্ভব হলো? তবে উল্লেখযোগ্য, ইয়ান ভ্যান আইকের ছবির আলোর উৎসের সঙ্গে ভারমেয়ারের ছবির আলোর উৎসের কিছুটা মিল হয়তো আছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্যান আইককে ভারমেয়ারের পূর্বসূরী বলা যেতে পারে।

ভারমেয়ার-এর খুব বেশি ছবি পাওয়া যায়নি। তিনি ছবির মধ্যে বিশেষ কোন দর্শন কিংবা বিশেষ কোন মতামত প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন মনে হয় না। তাঁর প্রায় সব ছবিই খুব সাধারণ ঘরোয়া পরিবেশের দৃশ্য। কোন বিশেষ মুহূর্তকে চিরন্তন করে রাখা অমোঘ মুহূর্ত। সিনেমাটোগ্রাফির দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো, ছবিতে প্রকৃতির আলোর স্বাভাবিক ব্যবহার। প্রায় প্রতিটি ছবিতে জানালা দিয়ে প্রকৃতির আলো এসে ছবির সমস্ত পরিবেশকে স্নিগ্ধ, সুন্দর করেছে। আলোর উৎস থেকে বস্তুর, চরিত্রের দূরত্ব অনুযায়ী আলো-ছায়ার স্তরবিন্যাস, টোনাল রেঞ্জ বজায় রাখা হয়েছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে। আরো যেটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, মনে হয় না যে জানালা দিয়ে সূর্যের আলো সরাসরি বস্তু বা চরিত্রের উপর পড়েছে। মনে হয় আলো যেন কোন কিছুতে প্রতিফলিত হয়ে ক্যানভাস আলোকিত করেছে। সর্বাধুনিক সিনেমাটোগ্রাফির 'বাউন্স লাইট' যেন। ছবির মধ্যে কোথাও গাঢ় ছায়া নেই, যেটা ভ্যান আইকের ছবিতে আছে। মূলত এটাই ভারমেয়ার-এর ছবির মৌলিকতা, নিজস্বতা, যেটা সিনেমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রবণতা।

বর্তমান স্বাভাবিক আলোকায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভারমেয়ার-এর চিত্রকলার প্রভাব অস্বীকার করা তো যায়ই না, বরং বলা যেতে পারে স্বাভাবিক আলোকায়ন শৈলীর দৃষ্টিকোণ থেকে ভারমেয়ার-এর ছবিই আমাদের পথপ্রদর্শক। রেমব্রান্ট ও ভারমেয়ার ছাড়া আরও কয়েকজন রেনেসাঁ চিত্রশিল্পীর চিত্রকলার প্রভাব থাকতে পারে আধুনিক সিনেমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে। বিশেষ ভাবে করোজিও-র বেশ কয়েকটি ছবিতে আলোর উৎস হিসাবে মোমবাতি দেখানো হয়েছে এবং মোমবাতিকে কেন্দ্র করে সমস্ত

ছবিতে স্বাভাবিক আলো-ছায়ার সুন্দর বিন্যাস করা হয়েছে স্বাভাবিক আলোকায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে । এই প্রসঙ্গে ভ্যান গঘের 'আলুভোজীরা' এবং পিকাসোর 'মৃত্যুশয্যায় মা' ছবি দুটোতে স্বাভাবিক আলোকায়ন পদ্ধতির প্রয়োগও উল্লেখযোগ্য । একটু নিবিড় ভাবে ইম্প্রেসনিস্ট গোষ্ঠীর ছবিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অনেক ইম্প্রেসনিস্ট শিল্পী বিচ্ছিন্ন ভাবে দুই-একটা ছবিতে সুন্দর আলোর উৎসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে স্বাভাবিক আলোকায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন ।

আমাদের দেশের কোন চিত্রকরের ছবিতে আলোর উৎসের কোন সুনির্দিষ্ট ঘরাণা নেই । তাই ভারতীয় চিত্রকলা সিনেমাটোগ্রাফারদের কোনভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি মনে হয় । যদিও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে আছে তাঁর নিজস্ব এক বিশেষ ধরনের আলো । কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, সেই কোন প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে আলোকবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা হয়েছে, ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছে সূর্যমন্দির, সূর্যঘড়ি । ছায়া যেখানে সময় নির্ধারক ।

ভাস্কর্য, স্থাপত্য তলবিশিষ্ট, তাই আলো-ছায়ার অধীন । এই কারণেই ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে আলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই কারণেই ভাস্কর্য, স্থাপত্য নির্মাণে, স্থান নির্বাচনে, আকার-আকৃতির পরিমাপে আলো একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই প্রসঙ্গে রামকিংকর বেইজ-এর 'আলোক বর্তিকা' ভাস্কর্যটি গুরুত্বপূর্ণ । রামকিংকর বোধহয় প্রথম ভাস্কর, বিদেশের কথা জানি না, যিনি ভাস্কর্যে কৃত্রিম আলোর ব্যবহার করে তা বিশেষ ব্যঞ্জনা-মণ্ডিত করেছিলেন । শান্তিনিকেতনে ভাস্কর্যটি আজও আছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় 'আলোকবর্তিকা'র ভাস্কর্যের আলোগুলি এখন জ্বলে না । বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথ কি অবাক হতেন ?

যেহেতু প্রাচীন ভারতে প্রকৃতির মধ্যেই বৃহদাকার, মনুমেন্টাল ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়েছে এবং এইক্ষে ত্রে একমাত্র আলোর উৎস ছিল সূর্য । সূর্যের আলো-ছায়া সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল । আলো-ছায়ার এই পরিবর্তন ভাস্কর্যে এবং স্থাপত্যে কী ধরনের আকৃতিগত পরিবর্তন করে, কী ধরনের ব্যঞ্জনা, নতুন মাত্রা সৃষ্টি করত, তা অতীব রহস্যময় । তবে, সূর্যাস্তের সময় এবং পূর্ণিমা রাতে যমুনাতীরের 'তাজমহল'-এর রূপ যে অন্যরকম, অবর্ণনীয় হয়ে যায়—এই সত্য বোধহয় কেউই অস্বীকার করবেন না ।

'সিসিল বি ডেমিল'-এর নামের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত । হলিউড কাঁপানো পরিচালক । এক সময় তাঁর একটা ছবিতে এমন ভাবে, অনেকটা মঞ্চের অনুকরণে আলোক বিন্যাস করলেন সিনেমাটোগ্রাফার—যার ফলে চরিত্র এবং বস্তুর অর্ধেকটা আলোকিত হল, আর বাকিটা থাকলো ছায়াতে । সেই ছবির চরিত্র এবং বস্তুর বেশী-ভাগটাই যেন রইলো অন্ধকারে। ডেমিল ছবি শেষ করে পাঠিয়ে দিয়েছেন পরিবেশকের কাছে । ছবি দেখে পরিবেশকের মাথায় যেন বাজ পড়লো । টেলিগ্রাম করলেন ডেমিলকে— 'আপনি কি পাগল হতে চলেছেন ? আপনি ভাবতে পারেন একটা চলচ্চিত্রে অর্ধেক মানুষ দেখিয়ে আপনি পুরো দামে বিক্রি করবেন ?'

ডেমিল তো হতবাক ! এর কি উত্তর দেবেন ? দিশেহারা ডেমিল খুঁজতে লাগলেন বাঁচার রাস্তা । খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত পেয়েও গেলেন যুক্তি এবং উত্তর । মনে পড়ে গেল একদা দেখা ইউরোপীয় এক প্রতিভাধর চিত্রকরের পেইনটিং-এর স্মৃতি । তারপরেই পাঠালেন পরিবেশকের টেলিগ্রামের জবাব—

'আপনি সেই বোকাদের মধ্যে একজন, যারা ছবি দেখার সময় রেমব্রান্টের আলো-ছায়ার ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করে না । দোহাই, আমাকে দোষারোপ করবেন না ।'

ডেমিলের জবাব পেয়ে পরিবেশক যেন অতল সমুদ্র থেকে ভেসে উঠলেন কোন এক যাদু মন্ত্রে । তাঁদের মগজে খেলে গেল ধূর্ত এক ব্যবসায়িক বুদ্ধি । খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে সগৌরবে ঘোষণা করলেন—

'রেমব্রান্ট ধারায়' আলোকিত প্রথম ছবি ।'

বিজ্ঞাপনে কাজ হলো । রাতারাতি জনপ্রিয় হলো ছবিটা । মানুষ উপলব্ধি করলো চলচ্চিত্রে আলো-ছায়ার ব্যঞ্জনা । সৃষ্টি হলো চলচ্চিত্রের নতুন আলোক-বিন্যাস পরিকল্পনা ।

ঐ ভাবে সত্যমিথ্যা জড়িয়ে, অবস্থার শিকারে পৃথিবীর চলচ্চিত্রে সত্যি সত্যি সৃষ্টি হলো বিশেষ এক ধারার লাইটিং, আলোছায়ার বিন্যাস, যা সিনেমাটোগ্রাফির ভাষায় 'রেমব্রান্ট লাইটিং' । আর এই ভাবেই চিরকালের জন্য চলচ্চিত্রে চির-স্মরণীয় হয়ে রইলেন চিত্রকলার এক সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী রেমব্রান্ট, তাঁর শিল্পধারায়, আলোক-বিন্যাস পরিকল্পনায়, তাঁর সৃষ্টিতে।